নারীর কথা
NARIR KATHA

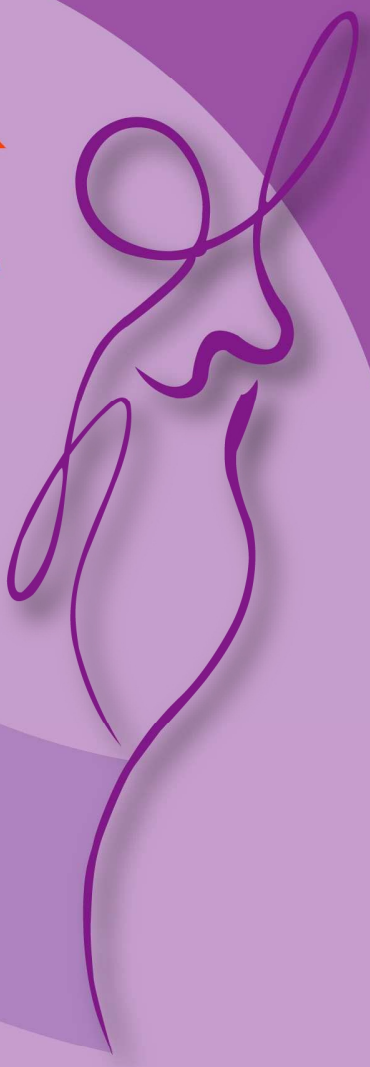

THE HUNGER PROJECT

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট

নারীর কথা - ১

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত

সম্পাদনায়
ড. বদিউল আলম মজুমদার

৮ মার্চ, ২০০৬

THE HUNGER PROJECT দি হাঙ্গার প্রজেক্ট

নারীর কথা-১

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত

সম্পাদক
ড. বদিউল আলম মজুমদার

সহযোগী সম্পাদক
নাছিমা আক্তার জলি

নির্বাহী সম্পাদক
শশাঙ্ক বরণ রায়

প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ২০০৬
কপিরাইট : দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ : রানা চৌধুরী

মুদ্রণে : ইনোসেন্ট
১৩২, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০

প্রকাশক:
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট
৩/৭ আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১১-২৬২২, ৮১২-৭৯৭৫, ফ্যাক্স : ৮১১-৬৮১২

Narir Katha - 1
(Collected writings on the occation of International Women Day)
First Published : March, 2006
Published by :
The Hunger Project-Bangladesh
3/7 Asad Avenue, Mohammadpur, Dhaka-1207
Tel: 811-2622, 812-7975 Fax: 811-6812
E-mail: thpb@bangla.net
Web: www.thpbd.org, www.thp.org/Bangladesh

সম্পাদকীয়

ক্ষুধামুক্ত, আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গঠনের প্রত্যাশা নিয়ে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ সারা দেশে কাজ করে যাচ্ছে। 'নারীর ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে ইউনিয়ন ভিত্তিক গণজাগরণ' গড়ে তোলার মাধ্যমে প্রত্যাশার সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে উঠবে বলে এই স্বেচ্ছাব্রতী সংস্থা বিশ্বাস করে। এই চেতনায় একদিকে যেমন তৃণমূল পর্যায়ের মানুষদেরকে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, উঠান বৈঠক প্রভৃতির মাধ্যমে সচেতন ও সংগঠিত করার কাজ চলছে, অন্যদিকে স্থানীয় সরকার, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে এডভোকেসি পরিচালনা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের পশ্চাৎপদতার অনেকগুলো ক্ষেত্রের অন্যতম হচ্ছে নারীদের পশ্চাৎপদতা। এদেশের নারীরা যুগ যুগ ধরে বঞ্চনা, বৈষম্য আর নির্যাতনের শিকার। সুদূর অতীতকাল থেকে বিরাজমান এই নেতিবাচক পরিস্থিতি আমাদের সামগ্রিক অগ্রগতির অন্যতম প্রতিবন্ধক। দীর্ঘ দিন ধরে নারী উন্নয়নে নানান প্রচেষ্টা সক্রিয় থাকলেও এক্ষেত্রে অগ্রগতি মোটেও সন্তোষজনক নয়। তাই নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা আমাদের অন্যতম অগ্রাধিকার।

মূলত সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা, ক্ষমতায়নের অপরিহার্যতা ও প্রক্রিয়া বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করার মাধ্যমে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট কাজ করছে। এ কাজের মূল চালিকা শক্তি একদল স্বেচ্ছাব্রতী উজ্জীবক, যারা সামাজিক দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে নিজের এবং সমাজের উন্নয়নে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে নিজেদের সামর্থ্য, মেধা ও শ্রমকে কাজে লাগিয়ে তৃণমূল পর্যায়ের অনেক নারীই তাদের অবস্থা ও অবস্থানের তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়েছে। একই সাথে তারা নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে কাঙ্ক্ষিত সামাজিক পরিবর্তন ঘটানোর লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই সফলতা অর্জিত হচ্ছে। এ অর্জন মূলত তাদেরই। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ এসব কার্যক্রমে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে। তৃণমূল পর্যায়ের নারীদের সূচিত এই দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের নারী জাগরণের জন্য শিক্ষণীয় হতে পারে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০০৬ উদ্‌যাপনের প্রাক্কালে আমরা নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পেতে চাই এবং তৃণমূল পর্যায়ের সাহসী-সংগ্রামী নারীদের অভিজ্ঞতা থেকে নারী জাগরণের শিক্ষা গ্রহণ করতে চাই। আমাদের সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নারী-পুরুষ বৈষম্যমুক্ত সমতার বাংলাদেশ গড়ে উঠবে – এই প্রত্যাশা নিয়ে প্রকাশিত হল 'নারীর কথা'।

ড.বদিউল আলম মজুমদার
গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট

নারীর ক্ষমতায়ন : কেন এবং কোন পথে?

ড. বদিউল আলম মজুমদার, গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট

প্রতি বারের মতো এবারও আবার ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ব্যাপকভাবে পালিত হচ্ছে। এর অংশ হিসেবে অনেক র‍্যালি, সমাবেশ ও আলোচনা সারা দেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অনেক সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তি এ উদ্‌যাপনের সাথে জড়িত। তবে অনেক ক্ষেত্রে দিবসটি পালিত হচ্ছে নিতান্ত প্রাণহীন অনুষ্ঠান আর আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের মূল চেতনা যেন এসব ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

১৮৫৭ সালের এই দিনে নিউইয়র্কের একটি সূচ কারখানায় বেতন বৃদ্ধি, কাজের সময় সীমিতকরণ ও কর্মক্ষেত্রে পরিবেশ উন্নয়নের দাবি'তে নারী শ্রমিকদের ঐতিহাসিক সংগ্রামের স্মরণে প্রতি বছর পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। শ্রমিকের অধিকার অর্জনের পাশাপাশি নারীর অবস্থার এবং অবস্থানের পরিবর্তন এ দিবসটির মূল চেতনা। তবে প্রতি বছর দিবসটি পালিত হয় মূলত নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যকে সামনে নিয়েই।

আমাদের দেশে নারীরা ব্যাপকভাবে নিগৃহীত, নিপীড়িত ও বঞ্চিত। যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় যা চলে আসছে। বগুড়ার মহাস্থান গড়ের প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে গেলে এর সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে। জাদুঘরে ঢুকলেই পাথরে খোদাই করা হাজার বছরের পুরানো একটি ভাস্কর্য চোখে পড়ে, যাতে একজন নারীকে চুলের মুঠি ধরে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করছে একজন পুরুষ। তখনকার সমাজে নিশ্চয়ই এটি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না, বরং ছিল বিরাজমান সংস্কৃতিরই অংশ। তাই এটি ভাস্কর্যে স্থান পেয়েছে। আবহমান কাল থেকে বিরাজমান এই অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যেই নারীর ক্ষমতায়ন।

ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া

তবে নারীর ক্ষমতায়ন কী এবং কোন পথে? নারীর ক্ষমতায়ন একটি বহুল ব্যবহৃত ও আলোচিত প্রসঙ্গ হলেও, এর সম্পর্কে অনেকের ধারণা অস্পষ্ট। অনেক ক্ষেত্রে এটি শুধু শোগান মাত্র। নিঃসন্দেহে ক্ষমতায়নের উৎস 'ক্ষমতা'। ক্ষমতা দিয়েই কিংবা ক্ষমতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করার মাধ্যমেই ক্ষমতায়ন সম্ভব। নারীরা সচরাচর ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত। তাই নারীর ক্ষমতায়ন অত্যন্ত জরুরি।

ক্ষমতার উৎস সাধারণত চারটি। প্রথমত, *ধন-সম্পদ ও অর্থ-বিত্ত*। এগুলো মূলত বস্তুগত। যুগে যুগে সব সমাজেই বিত্তশালীরা অধিক ক্ষমতাধর ছিলেন। আমাদের সমাজও তার ব্যতিক্রম নয়। অর্থ-বিত্তের মালিকানার দিক থেকে নারীরা চরমভাবে বঞ্চিত। পারিবারিক উত্তরাধিকার থেকে শুরু করে কর্মক্ষেত্রেও এ বঞ্চনা বিরাজমান। এমনকি আজকের আধুনিক সমাজেও নারীরা একই কাজের জন্য সাধারণত সমান মজুরি পায় না। বাংলাদেশে উপার্জনকারী নারীর সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। তাই নারীকে ক্ষমতায়িত করতে হলে অর্থ-বিত্তের উপর নারীর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে এবং তাকে উপার্জনক্ষম করে তুলতে হবে।

ক্ষমতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস *মানব সম্পদ*। অধিক মানব সম্পদের মালিকরা স্বাভাবিকভাবেই বেশি ক্ষমতায়িত। মানসম্মত শিক্ষা, দক্ষতা, সুস্বাস্থ্য, কর্মক্ষমতা ইত্যাদি মানব সম্পদের নিয়ামক। নারীরা আমাদের সমাজে কম শিক্ষিত, তারা ব্যাপকভাবে অপুষ্টিতে ভোগে, কম বিত্তের নারীরা সাধারণত স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত। পারিবারিক সেবা যত্ন ও সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ও সমাজের জন্য অতি প্রয়োজনীয় দক্ষতা থাকলেও, এর কোন বাণিজ্যিক মূল্য নেই। অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতার ফলে অনেক ক্ষেত্রে নারীদের কর্মক্ষমতাও কম। তাই নারীকে সত্যিকারভাবে ক্ষমতায়িত করতে হলে তার জন্য মানব সম্পদ অর্জনের এবং অর্থবহ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে।

ক্ষমতার অপর একটি উৎস *প্রদত্ত বা অর্জিত ক্ষমতা*। যেমন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। আমাদের সমাজে নারীরা পরিবার থেকে রাষ্ট্রীয় অঙ্গন পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত। উদাহরণ স্বরূপ, আমাদের জাতীয় সংসদে সরাসরি আসনে নির্বাচিত নারীর সংখ্যা ৭ জন, অর্থাৎ মাত্র ২ শতাংশ। যদিও পরবর্তীতে ৪৫ জন নারীকে সংরক্ষিত আসন থেকে 'নির্বাচিত' করা হয়, এদের অবস্থান মূলত ক্ষমতা কাঠামোর বাইরে। তাই নারীর অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে পারিবারিক অঙ্গনে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার সাথে সাথে তাকে রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত করতে হবে। সংগঠিত হওয়ার মাধ্যমে অবশ্য নারী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্জনের সুযোগ লাভ করতে পারে। সংগঠিত নারী আয়-উপার্জনের ক্ষেত্রেও সফলতা অর্জন করতে পারে।

ক্ষমতার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উৎস মানুষের *অন্তর্নিহিত শক্তি*। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, আত্মশক্তি বা নিজের মধ্যেকার ধন। আত্মবিশ্বাস, আত্মপ্রত্যয়, ইচ্ছাশক্তি, প্রতিশ্রুতি, মননশীলতা ইত্যাদি বিকশিত আত্মশক্তির বৈশিষ্ট্য। এগুলোই মানুষের মূল পুঁজি। ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষই আত্মশক্তি সম্পন্ন। তাই আত্মশক্তি বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার সূচনা হওয়া আবশ্যক। কারণ আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি দরিদ্র নয় এবং দারিদ্র্যের মধ্যে থাকতে পারে না।

নারীর ক্ষমতায়নের ফলাফল

নারীর ক্ষমতায়নের ফলাফল সুদূর প্রসারী। নারী ক্ষমতায়িত হলে তার সুফল শুধু সে নিজেই ভোগ করে না, তার পরিবার, সমাজ, এমনকি পুরো জাতি এ থেকে উপকৃত হয়। যেমন, আত্মশক্তিতে বলীয়ান নারী সফল হতে বাধ্য। যে দিকেই সে নিবিষ্টতা প্রদর্শন করুক, সেখানেই তার সাফল্য নিশ্চিত। একজন সফল নারী তার পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য বোঝা না হয়ে সম্পদে পরিণত হয়।

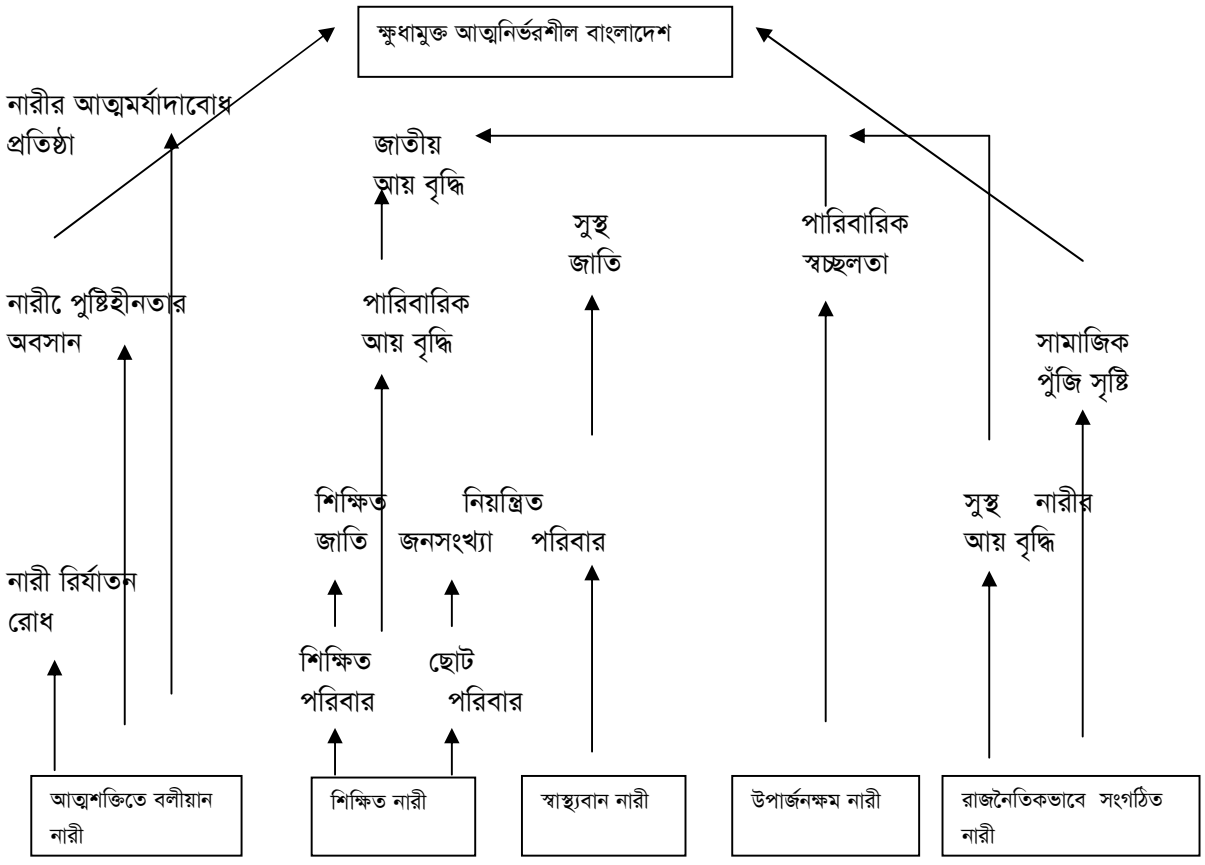

নারী শিক্ষিত হলে তার সামর্থ্যের বিকাশ ঘটবে, যা হবে তার জন্য মানব সম্পদ। এর প্রভাব পড়বে পরিবারের এবং পর্যায়ক্রমে সমগ্র জাতির ওপর। শিক্ষিত নারীর পরিবার ছোট ও শিক্ষিত হবে। ছোট পরিবার জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে সহায়ক। শিক্ষিত পরিবারই শিক্ষিত ও প্রগতিশীল জাতির স্তম্ভ। এছাড়াও শিক্ষিত নারী পারিবারিক আয় বৃদ্ধি এবং জাতির সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করবে।

নারী পুষ্ঠিহীনতায় না ভুগলে এবং স্বাস্থ্যবান হলে তার কর্মক্ষমতা বাড়বে। তার সন্তানও হবে সুস্থ ও মেধাসম্পন্ন। ফলে জাতির সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত হবে এবং উৎপাদনশীলতা বাড়বে। বর্তমান বিশ্বের মেধা নির্ভর প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশকে এগিয়ে যেতে হলে নারীর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার কোন বিকল্প নেই।

উপার্জনশীল নারী নিজের, পরিবার এবং জাতির উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতিতে তাদের অবদান নিশ্চিত হবে। প্রতিষ্ঠিত হবে সিদ্ধান্তগ্রহণে তাদের অধিকার। ফলে নারীর সামাজিক অবস্থানের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে। উপার্জনের সুযোগের ফলে নারী-পুরুষের মাঝে সমতা সৃষ্ঠির পথ সুগম হবে এবং পারিবারিক ক্ষমতা কাঠমোতে নারীর অবস্থানকে সুদৃঢ় করবে। অর্থনৈতিক সক্ষমতা নারীর অন্যান্য অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রেও নারীকে সক্ষম করে তুলবে।

রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত নারীরা একটি সামাজিক শক্তিতে পরিণত হতে পারে। যে শক্তি বিরাজমান বৈষম্য-নিপীড়নের বিরুদ্ধে কার্যকর লড়াইয়ের সূচনা করতে পারে। বিরাজমান ক্ষমতা কাঠামোতে পরিবর্তন আনতে হলে যার কোন বিকল্প নেই। সংগঠিত হওয়ার মাধ্যমে এ লক্ষ্যে নারীরা শক্তি-সাহস অর্জন এবং তাদের ন্যায্য অধিকারগুলো আদায় করতে পারে। নারীরা সংগঠিত হলে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ হবে। এছাড়াও সংগঠিত শক্তি হিসেবে নারীরা সামাজিক সমস্যার সমাধানে এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির অগ্রগতির জন্য নারীর ক্ষমতায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও, বাংলাদেশ এক্ষেত্রে খুব অগ্রগামী অবস্থানে নেই। অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ এবং উভয় ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে ইউএনডিপি প্রতি বছর নারীর ক্ষমতায়নের সূচক (gender empowerment measure) প্রকাশ করে। এই সূচকে ২০০৫ সালে বিশ্বের ১৭৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৭৯তম, যা কোনভাবেই উৎসাহব্যঞ্জক নয়।

তবে নারীর ক্ষমতায়নে দ্রুত অগ্রগতি ছাড়া আমাদের সামনেকার অনেকগুলো সমস্যার কার্যকর সমাধান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না। উদাহরণস্বরূপ, সারা বিশ্ব জুড়ে বর্তমান সময়ের একটি ভয়াবহ সমস্যা হল এইড্স। এ সমস্যা বাংলাদেশে এখনো প্রকট না হলেও, পাশ্ববর্তী দেশ ভারতে এটি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছে। ফলে বাংলাদেশও এইড্স এর মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। বাংলাদেশের নারীদের অধস্তন অবস্থার কারণে এ ঝুঁকি আরও ভয়াবহ। আফ্রিকার অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এইড্স শুধু স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ইস্যুই নয়, এটি জেণ্ডার ইস্যুও বটে। পুরুষের একতরফা দাবি'র মুখে নিজের জীবন ও শরীরের উপর নারীর অধিকার নিশ্চিত না হওয়ার কারণে এ মরণব্যাধির এত ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। তাই নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত হলে এইড্স এর মতো একটি ভয়াবহ সমস্যা আমাদের পক্ষে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

গোপালগঞ্জের নাসিমার গল্প

নাছিমা আক্তার জলি

নাসিমা একটি মেয়ে, কেবল একটি মেয়ে নয়– আন্তর্জাতিকভাবে আলোচিত একজন বলিষ্ঠ নারী। অনেক চড়াই-উৎড়াই পার হয়ে জীবন সংগ্রামের বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে নাসিমা আজ অর্জন করেছে আত্মনির্ভরশীল জীবন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও পরিবারের নিষ্ঠুর পীড়ন উপেক্ষা করে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস সংগ্রাম ও পরিশ্রম করে আজ তার ফল ভোগ করছেন তিনি। জীবনের শুরুতেই আচমকা এক ঝড়ো হাওয়া এসে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল তার কিশোরী জীবনের স্বপ্নময় দিনগুলোকে। সব চাওয়া-পাওয়া নির্বাসিত হয়েছিল নির্জন দ্বীপে। সেই নাসিমা নামের কিশোরী মেয়েটি এখন বাংলাদেশে তো বটেই আর্ন্তজাতিক পরিমণ্ডলেও ব্যাপক পরিচিত। আত্মপ্রতিষ্ঠার পাশাপাশি উন্নয়নের সঙ্গী করেছে আরও ৩০০ জন নারীকে। তাদেরকে ঘুরে দাঁড় করিয়েছেন জীবনের মুখোমুখি। নিজে বাঁচতে শিখেছেন, শিখিয়েছেন অন্যকে। তার মাধ্যমে অনেকের কাছেই স্পষ্ট হয়েছে বেঁচে থাকাটা জরুরি– নিজের জন্য না হলেও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য। নাসিমাসহ তার সহযোগী নারীরা সকলেই অন্তর থেকে বিশ্বাস করে– এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার প্রত্যেকটি মানুষের আছে, প্রত্যেকেই চায় আত্মনির্ভরশীলতার পথ ধরে সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচতে। ভাগ্য বলে কিছু নেই। মূলত মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য গড়ার কারিগর। যদি পাশে থাকে সহায়ক পরিবেশ অথবা বিরূপ পরিবেশকে যদি উপেক্ষা করে এগিয়ে যাওয়া যায়।

নাসিমার জন্ম ১৯৬১ সালে ১৩ অক্টোবর গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী থানার পারুলিয়া ইউনিয়নের শিবপুর গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। বাবা ছোট খাট একটি চাকুরি করতেন। ভাই বোনদের মধ্যে সেই সব চেয়ে বড়। তার জন্মের পর পরই পরিবারে নেমে এসেছিল এক উচ্ছল আনন্দের তরঙ্গ। বাবা মা অনেক আদরে মানুষ করেছিলেন তাকে। সবে মাত্র দশম শ্রেণীতে উঠেছে। জীবনের শৈশব-কৈশর কি ভালো করে বোঝার বয়সও হয়ে ওঠেনি তখন। দু'পাশে বেনি ঝুলিয়ে নাসিমা গ্রামের হাইস্কুলে যায়। দু'চোখ ভরে স্বপ্ন দেখে। পড়াশুনা শেষ করে ডাক্তার হবে। সারা গ্রামের মানুষের সেবা করবে। স্বপ্নের সিঁড়িতে পা রাখতে না রাখতেই হঠাৎ এক কাক ডাকা ভোরে নাসিমা দেখল বাড়িতে কিসের এক আয়োজন চলছে। মার মুখটি থমথমে, বাবা অত্যন্ত ব্যস্ত এবং চঞ্চল। কেন এই পরিবর্তন? কিসের এতসব আয়োজন? এসব বিষয় নাসিমাকে ভাবনায় ফেললেও সে কাউকে প্রশ্ন করতে পারছে না। চোখেমুখে আনন্দের কোন ছোঁয়া নেই। বাবা নিবিষ্টমনে কাজ করে চলছেন।

বাড়িতে লোকজন আসছে। নাসিমার খুব শুনতে ইচ্ছে হলো কেন এত আয়োজন, কিন্তু প্রশ্ন করবে কাকে? কিশোরী বয়সে কাউকে কোন প্রশ্ন করাটাও যে বেয়াদবী! সমাজ এমনই কতকগুলি নিয়ম নির্ধারন করেছে। তার মধ্যে এটি একটি নিয়ম– এই বিষয়ে কারো কাছে কোন কিছু জানতে চাওয়া মানে এক ধরনের ধৃষ্টতা। মেয়ে হবে ভদ্র, নম্র, যা বলা হবে তাই শুনবে। তাই নাসিমার জানা হলো না।

বাবা পরিবারের একমাত্র সিদ্ধান্ত দাতা। তিনি যা বলবেন তাই হবে। কখনই কোন বিষয় জানার বা আলাপ করার সুযোগ পান নি বা দেয়া হয় নি। ফলে অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া ঠিক নয়, এটি মা জানলেও, বাবার সিদ্ধান্তের উপরে কারও কথা বলার অধিকার ছিল না। স্বাভাবিক নিয়মে যা হয়ে থাকে তাই হলো। নাসিমার বিয়ে হয়ে গেল পাশের গ্রামের ২২ বছরের এক বেকার যুবকের সাথে। তখন ১৯৭৯ সাল, নাসিমা সবেমাত্র এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছেন। শ্বশুর বাড়িতে পদার্পন করা মাত্রই সাংসারিক সব বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হলো নাসিমার ওপর। যে বয়সে তার বন্ধুদের সাথে খেলার কথা, স্কুলে যাওয়ার কথা সেই বয়সেই তাকে পুরো গৃহিনী হতে হলো। পরিবারের ১২ সদস্যের তিন বেলার খাবার সময়মত প্রস্তুত করা, পরিবেশন করা, শোবার ঘর থেকে শুরু করে গোয়াল ঘর পর্যন্ত পরিস্কার করা এসবই তার দৈনন্দিন কর্মসূচি। বিবাহের কয়েকদিনের মধ্যেই শ্বশুর বাড়ির কাজের মেয়েটিকে বিদায় করে দেওয়া হয়। এক দিকে সংসারের কাজের

বোঝা অন্যদিকে বেকার স্বামী – দু'য়ের মাঝে মানসিক ও শারীরিক কষ্টের যাতাকলে পিষ্ট হতে থাকেন নাসিমা। ইতোমধ্যেই নাসিমার গর্ভে জন্ম নেয় প্রথম সন্তান।

জীবনের অধ্যায়গুলো খুঁজতে গেলেই নাসিমা মনের আবেগে বিহ্বল হয়ে পড়েন। একজন কিশোরী মাতার প্রসব-পূর্ব ও প্রসবের পরে যে সকল পরিচর্যা দরকার তার কোনটিই তার জীবনে মেলে নি। স্বামী মানসিকভাবে কিছু করতে চাইলেও পারিবারিক ও সামাজিক ভয়ে কিছুই করতে পারেন নি। ইতোমধ্যে একটা চাকুরিতে যোগ দিয়েছেন নাসিমার স্বামী।

একদিনের কথা নাসিমাকে অনেক বেশি কাঁদায়। ঈদের ছুটিতে প্রায় তিন মাস পর বাড়ি ফিরছেন তার স্বামী। সেদিনই দুপুরে রাঁধতে গিয়ে দুর্ঘটনাক্রমে নাসিমার হাত পুড়ে গেল। শাশুড়ী এ ঘটনা দেখে সমবেদনা জানানোর পরিবর্তে অত্যন্ত রেগে গেলেন। জোরে জোরে চিৎকার শুরু করলেন, "এ কোন বেহায়া মেয়েরে বাবা, গত তিন মাসে কিছু হলো না। আজ আমার ছেলে বাড়ি ফিরবে আর আজই হাতটি পোড়ালো...। এ অভিনয় ছাড়া কিছুই নয়, শ্বশুরবাড়ি থাকতে ভালো লাগে না বলে স্বামীর কাছে যাওয়ার জন্য এসবই ছলনা...।" যথা সময়ে স্বামী উপস্থিত হলেন বাড়িতে। বউ সম্পর্কে অনেক কটুক্তি মা-বাবা ও পরিবারের কাছ থেকে শুনতে হলো তাকে। এক পর্যায়ে তিনি নাসিমাকে তার চাকুরি স্থলে নিয়ে আসার জন্য প্রস্তাব দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাবা মা উভয়েই বললেন, ঠিক আছে তাকে নিয়ে যাও, তবে আমাদের শুশ্রূষা করতে পারে এমন একজনকে দেখে শুনে আমরা আবার বিয়ের ব্যবস্থা করি।

নাসিমার স্বামী তার প্রতি সহানুভূতিশীল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের হৈমন্তী গল্পের অপুর মতোই তার দশা। ভেবে চিন্তে কোন কুল কিনারা না পেয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন, তাকে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে অর্থ উপার্জন করতে হবে। শ্বশুর বাড়ির সহায়তা নিয়ে তিনি জাপানে চাকুরির আশায় পাড়ি জমালেন। এখানেও বিধিবাম। একদিকে অবৈধ পাসপোর্টর বেড়াজাল, অন্যদিকে তিনি হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসে আক্রান্ত। ডাক্তার বলেই দিয়েছেন- লিভার সিরোসিস হয়েছে, মৃত্যু তার সামনে। জাপান সরকার অসুস্থ মানুষ হিসাবে তাকে কোন শাস্তি না দিয়েই দেশে পাঠিয়ে দেয়। দেশে আসার পর বিভিন্ন চিকিৎসার মধ্য দিয়ে তিন বছর মোটামুটি ভালোই কাটালো। ইতোমধ্যে নাসিমা আবার দ্বিতীয় সন্তানের জননী হয়েছেন। দ্বিতীয় শিশুটির বয়স ০৯ মাস। নাসিমার স্বামী মারা গেলেন এমন সময়ে। নাসিমার জীবনে আর এক কালো অধ্যায়ের সূচনা হলো।

স্বামী মারা যাবার পর পূর্বের কর্মস্থল থেকে তাকে ৬০ হাজার টাকা প্রদান করার সিদ্ধান্ত হয়। এই টাকা নিয়ে নতুনভাবে নির্যাতনের আর এক মাত্রা যোগ হলো তার জীবনে। শশুরবাড়িতে বিভিন্ন ধরনের অবান্তর আলোচনা শুরু হলো। এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করা হলো যাতে করে তিনি সন্তান দু'টিকে রেখে অন্যত্র চলে যান। সেইসব নিষ্ঠুরতার কথা মনে পড়লে নাসিমার চোখ ছল ছল করে ওঠে আজও। একদিকে স্বামীর জন্য মাটির অন্ধকার গর্ভে সাড়ে তিন হাত ঘর তৈরি হচ্ছে, অন্যদিকে নাসিমার শ্বশুর পক্ষ তার স্বামীর সম্পদের হিসেব-নিকেশ শুরু করেছে ভাগ বাটোয়ারার জন্য। এরই মাঝে অস্তিত্বের সংকটে ঘুরপাক খাচ্ছে দু'টি মাসুম বাচ্চা। এরকম একটি মহাবিপদের সময় নাসিমা আস্তে আস্তে নিজের ভিতকে শক্ত করার লক্ষ্যে নিজেকে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী ও আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলেন।

নাসিমা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সহযোগিতায় টাইপের কাজটি শিখে নেন ১৯৯৪ সালে। নতুন করে জীবন গড়ার লক্ষ্যে পড়াশুনা শুরু করেন। এর পর মহিলা অধিদপ্তরের 'অঙ্গনা' নামক শোরুমে সেল্সম্যান হিসাবে কাজ শুরু করেন। শুরু হয় তার অর্থনৈতিক সংগ্রামের যাত্রা। নাসিমা এক সময় জানতে পারেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট নামক স্বেচ্ছাব্রতী সংগঠনের কথা। বিভিন্ন প্রসঙ্গে অনেক কথা হয়। কথা হয় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট কি, নারী উন্নয়নে তারা কিভাবে কাজ করছে ইত্যাদি বিষয়ে। এর পর দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আহ্বানে ১৪৩তম ব্যাচে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ নেয়ার সুযোগ হয়। এ প্রশিক্ষণ নাসিমার জীবনে নিয়ে আসে আমূল পরিবর্তন। পাল্টে ফেলে তার চিন্তা চেতনায় জগৎকে। এক নতুন অগ্নি পরীক্ষা শুরু হয়। প্রশিক্ষণ শেষে নিজের হাতে করা ১০টি কুশন কভারকে পুঁজি করে শুরু হয় তার আত্মনির্ভশীলতার অভিযান। নিজ এলাকায় বিভিন্ন স্কুলের সামনে গিয়ে মায়েদের সাথে কথা বলেন, কুশন কভার দেখিয়ে অর্ডার নেয়া শুরু করেন। এক পর্যায়ে নাসিমা দেখলেন যতগুলি অর্ডার পেয়েছেন তা একার পক্ষে করা সম্ভব নয়। এবার যুক্ত হলো নতুন মাত্রা। নাসিমা স্থানীয়ভাবে তার মত

নির্যাতিত, অসহায়, অবলম্বনহীন নারীদেরকে সংগঠিত করলেন। সৃষ্টি হলো 'বাংলাদেশ হোম ওর্য়াকার এসোসিয়েশন'। তিনি প্রমাণ করলেন আমার বাড়িই আমার কর্মস্থল (My home is my Work place)।

গত পাঁচ বছরে প্রায় তিনশ' জন নারী তার এই সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন। নাসিমার পদটি বদলেছে, তিনি এখন কর্মী নন মালিক। এটি সত্য যে, অনেক কর্মীর হাতকে হাতিয়ারে পরিণত করেছেন তিনি। শুধু দেশের মাটিতেই নয়, ইতোমধ্যে নারী উদ্যোক্তা হিসেবে সার্কভুক্ত অনেক দেশেই তার যাওয়ার এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় করার সুযোগ ঘটেছে। মালোয়েশিয়া, ভারতের দিল্লী, গুজরাটসহ আরো অনেকগুলি দেশে নারীদের আর্থসামাজিক অবস্থা দেখা ও বোঝার সৌভাগ্য হয়েছে। তার মতে এ বিশ্বে সকল দেশে সকল সমাজেই নারীরা কম বেশি নিগৃহীত, লাঞ্ছিত, অবদমিত। তবে এর আকার ও ধরনের ভিন্নতা রয়েছে। পাশাপাশি আর একটি বিশ্বাস তার দৃঢ় হয়েছে, প্রতিটি লড়াকু নারীকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য অনেক ত্যাগ করতে হয়, সাধনা করতে হয়। পুরুষ শাসিত এ সমাজে নারীকে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে অবশ্যই অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরশীল হওয়া প্রয়োজন। যার জ্বলন্ত প্রমাণ তিনি নিজে।

নাসিমা এখন প্রতিমাসে কমপক্ষে ১২-১৫ হাজার টাকা আয় করেন। যে শ্বশুর-শাশুড়ী একদিন তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন, সে বাড়ির লোকজন এখন তাকে প্রতিদিন এ বাড়িতে যাবার জন্য আহ্বান করেন। তার পরিচয়ে অনেকেই পরিচিত হতে চায়। একজন নারীও যে কোন বংশের নেতৃত্ব দিতে পারে এটি সত্যিই সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে অবিশ্বাস্য। নাসিমার মত হাজারো নারী প্রতিষ্ঠিত হোক। জীবন সংগ্রামে ক্ষয়ে না যেয়ে বার বার প্রমাণ করুক, 'আমরাও পারি' আন্ত র্জাতিক নারী দিবসে এটিই মনে হয় সবার প্রত্যয় হওয়া উচিৎ।

মুক্তাগাছার আয়েশা আক্তার

শশাঙ্ক বরণ রায়

লাল টুকটুকে ফ্রক পরে মায়ের সাথে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠরত ছোট্ট মেয়েটি। অবারিত মাঠ আর গাছপালা ঘেরা বাড়িতে এসে উদ্বেল আনন্দ এবং তীব্র উত্তেজনায় অস্থির হয়ে ওঠে সে। পাড়ার ছোট ছোট শিশুদের সাথে নিয়ে সে যখন খেলাচ্ছলে পুতুলের সংসার গড়ায় মশগুল তখন তাকে নিয়ে এক অন্যরকম পরিকল্পনায় ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন গ্রামের বাড়িতে থাকা তার চাচা। মেয়েটির সহজ সরল মা'কে কিছুটা বুঝিয়ে কিছুটা চাপ প্রয়োগ করে তার বিয়ের ব্যবস্থা করেন তিনি। বাড়ির পাশের দরিদ্র পরিবারের এক লেখাপড়া না জানা যুবকের সাথে বিয়ে হয়ে যায় শিশুটির, 'বিয়ে' শব্দটির অর্থ বুঝে ওঠার আগেই। মেয়েটির নাম আয়েশা আক্তার।

শৈশব-শৈার পার হয়ে যাওয়ার অনেক পড়ের কথা। ১৯৯৮ সাল। আয়েশা তখন পঞ্চাশোর্ধ। পাশের গ্রাম আইনাতলা'র রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন একদিন বিকেলে। এমন সময় রাস্তার পাশে এক গৃহবধুকে কাঁদতে দেখতে পান। মেয়েটির নাম হাজেরা, বয়স ২৫ বছর। মেয়েটির সমস্যা জানতে চান তিনি। অনেক চেষ্টার পর জানতে পারেন হাজেরার স্বামী তাকে মৌখিকভাবে তালাক দিয়েছে সামান্য মনোমালিন্যের সূত্র ধরে। এদিকে তিনি গর্ভবতী। এটুকু জানিয়ে নিজের জীবনটা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে – এমন ভাবনায় প্রবল কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন হাজেরা। অনেক বুঝিয়ে গৃহবধুকে বাড়ি নিয়ে যান আয়েশা। তাকে বোঝান মৌখিকভাবে তালাক দেওয়া তালাক সম্পূর্ণ অবৈধ, কুসংস্কার মাত্র। হাজেরাকে সেদিনের মতো পাশের বাড়িতে রেখে আসেন। পরদিন ফজরের নামাজের সময় নিজের বড় মেয়ে এবং পাশের বাড়ির একজন মহিলাসহ আয়েশা উপস্থিত হন আইনাতলা গ্রামের মসজিদের সামনে। নামাজ পড়ে বেড় হলে মসজিদের মৌলভী এবং হাজেরার স্বামী কুদ্দুস আলীর মুখোমুখি হন। তারা কোন মহিলার সাথে কথা বলবেন না – একথা স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়ার পরও অনেক অনুনয়-বিনয় আর তর্কাতর্কির পর আলোচনায় সম্মত হন। ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন ব্যাখ্যা এবং বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় আইনের উল্লেখ করে দীর্ঘ আলোচনার পর তারা তাদের ভুল বুঝতে পারেন। সেদিনই স্বামীর বাড়ি ফিরে যান হাজেরা। বর্তমানে তিনি স্বামী-সংসার নিয়ে সুন্দর জীবন যাপন করছেন।

জেনে নেই এই অনন্য নারীকে

ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা উপজেলার সুহিলা গ্রামে আয়েশার জন্ম। বাবা মোঃ অহেদ আলী মণ্ডল, মা মোছাঃ জয়নবী বেগম। বর্তমানে ৪ ছেলে, ৩ মেয়ের জননী আয়েশার বয়স আনুমানিক ৬০ বছর। বাবা-মায়ের ৯টি পুত্র সন্তানের পর জন্ম নেয় একমাত্র কন্যা সন্তান। তাই আদরের কোন ঘাটতি ছিল না শৈশবে। গ্রামে জন্ম হলেও ছোট বেলা থেকেই ময়মনসিংহ শহরে থাকতেন পরিবারের সাথে। বাবা ব্যবসা করতেন, আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল তাদের। বড় ভাইয়ের সবাই কম বেশি লেখাপড়া করেছেন। স্বভাবতই স্বচ্ছলে লেখাপড়া চালিয়ে যাবার কথা আয়েশার। বাবারও স্বপ্ন ছিল তেমনই। কিন্তু মাত্র অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন তিনি। তারপর পুরোটা জীবন ধরেই স্বশিক্ষায় নিজেকে শিক্ষিত করে তুলছেন এই অনন্য নারী।

সংগ্রামময় পেছনের দিনগুলো

আয়েশার জীবনে সবচেয়ে বড় দুর্যোগ নেমে আসে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী থাকাকালীন বিয়ের মাধ্যমে। বাবার প্রতি চাচার হিংসার শিকারে পরিণত হন তিনি। এরপর আরও ভয়ংকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হন আয়েশা। বাবা তার আদরের ছোট্ট মেয়েটির বিয়ে কোনভাবেই মেনে নিতে পারেন নি। প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন তিনি। তার এই ক্ষোভের শিকার হন মা। তার মতামত না নিয়ে ছোট মেয়ের বিয়ে দেওয়ার অপরাধে তিনি স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। দীর্ঘ নয় মাস ভাইয়ের বাড়ি থাকার পর বাড়ি ফেরেন মা। ঘটনাটি শিশু আয়েশার মনের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। নিজেকেই যেন দোষী মনে হয় এতসব অঘটনের জন্য। মাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার ঘটনাটি তাকে বিষন্ন করে তোলে। '

বাবার ময়নসিংহের বাসায় থেকে যথারীতি স্কুলে পড়াশোনা চলতে থাকে আয়েশার। শশুরবাড়ির সাথে সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধ থাকে। পরিচিত মানুষেরা কিছুটা ভিন্ন চোখে দেখত তাকে। বিয়ে হয়েছে, কিন্তু স্বামীর সাথে যোগাযোগ নেই – এমন মেয়ের অন্ধকার ভবিষ্যৎ নিয়ে দুর্ভাবনাগ্রস্ত লোকের অভাব হয় না। আত্মীয়-পরিজনদের সম্মিলিত বিরোধীতার মুখে অষ্টম শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় অবশেষে তার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়।

এবারে জীবন যেন আরও দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। নিজেকে অভিশপ্ত মনে হয়। কৈশোর কালে এসে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে যান নিজেও। বাবা-ভাইয়ের পরিবারেও নিজেকে পরনির্ভরশীল মনে হয়। এভাবেই কাটতে থাকে তার বিয়ের পরের বছরগুলো। বিয়ের সাত বছর পর শশুরবাড়ির সাথে অনেক আলাপ-আলোচনার পর সমঝোতা হয়। আয়েশার স্বামীকে মেনে নেন তার বাবা। সিদ্ধান্ত হয় স্বামী মোঃ বছির উদ্দিন আয়েশার বাবার বাড়িতে থাকবেন। নতুন জীবন শুরু হয় আয়েশার।

তার বাবা আর স্বামীর পরিবারের মধ্যে আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে পার্থক্য ছিল। বছির উদ্দিন পৈত্রিকসূত্রে মাত্র এক বিঘা জমির মালিক ছিলেন। ফলে স্বামীর সাথে সংসার শুরু করার পরও আর্থিক পরনির্ভরতা অস্থির করে তোলে আয়েশাকে। সংসার শুরু করার আগে ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার ভাবনা থেকে কিছু হাতের কাজ শেখার চেষ্টা করেছিলেন। কোন প্রশিক্ষণ নিয়ে নয়, অন্যের কাজ দেখে দেখে। এবার সেই শিক্ষাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করলেন। বিভিন্ন কাপড়ে ও কভারে নক্সার কাজ করে কিছুটা উপার্জনও শুরু হল। অত্যন্ত যত্ন করে কাজগুলো করতেন তিনি। আস্তে আস্তে তাই অনেকের কাছ থেকেই প্রশংসা পেতে শুরু করেন।

খুঁজে পেলেন নতুন আলোর ঠিকানা

হঠাৎ করেই ১৯৯৯ সালের মাঝামাঝি আয়শা খবর পেলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট টাঙ্গাইলের গয়হাটা ইউনিয়নে একটি প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছে। এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে অনেকেই আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে আত্মনির্ভরশীল হয়েছেন। আগ্রহী হয়ে ওঠেন তিনি। মেয়ে লিপিকে নিয়ে ২৮-৩১ মার্চ, ২০০০ সালে চারদিন গয়হাটাতে অনুষ্ঠিত ৩৬তম ব্যাচে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ নিলেন। মনে সাহস আর উদ্যম নিয়ে ফিরে এলেন বাড়ি। এর আগেও কিছু প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছিলেন আয়েশা। কিন্তু সেগুলো সবই ছিল দক্ষতা বাড়ানোর প্রশিক্ষণ। উজ্জীবক প্রশিক্ষণ তার ভেতরটাকে যেন পাল্টে দিল। মানুষের চেতনাকে জাগিয়ে তুলে যে অনেক বড় কিছু করা যায়, পুরো দেশটাকে বদলে ফেলা যায় – এটা ভেবে ব্যাপক আলোড়িত হয়ে ওঠেন তিনি। নিজের ভেতর লুকিয়ে থাকা প্রচণ্ড শক্তিকে উপলব্ধি করলেন। প্রশিক্ষণে নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে অনুষ্ঠিত দীর্ঘ আলোচনা তার মনে দাগ কেটে যায় গভীরভাবে। প্রশিক্ষণ চলাকালেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন নারীদের নিয়ে কাজ করার। আয়বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, অধিকার প্রতিষ্ঠায় এবং নারী নির্যাতন রোধে ভূমিকা রাখতে হবে।

ব্যক্তিগত আর্থিক ভিত্তি মজবুত করার কাজে নিয়োজিত হলেন। এলাকার নারীদের মাঝে দৃষ্টান্ত সৃষ্টির লক্ষ্যে অত্যন্ত সাহসী ভূমিকা রাখতে শুরু করলেন। নিজের কষ্টার্জিত দক্ষতা আর হাতের কাজই প্রাথমিক পুঁজি হল তার। নিজের হাতে তৈরি পণ্য বিপণনের লক্ষ্যে আশেপাশের এলাকায় যেখানে যে মেলা বসে সেখানেই আয়শা হাজির হন তার পসরা নিয়ে। এক দেড় বছর এভাবেই কাটলো। চারদিকে তার তৈরি কাজের সুনাম ছড়িয়ে পড়লো। পরবর্তীতে পাইকাররা তার বাড়ি থেকে পণ্য কিনে নিতে শুরু করলো। শীতকালে বাংলাদেশে প্রচুর মেলা হয়, উৎসব চলে বিভিন্ন জায়গায়। তাই শীত মৌসুমে বিক্রি হয় ভালো। প্রতি মাসে আয় হয় ৮/১০ হাজার, অন্য মৌসুমে ২/৩ হাজার টাকা। সংসারের অভাব অনটন অনেকটা দূর হল। একপর্যায়ে মা-মেয়ে মাটির কাজের পাশাপাশি মৌ-চাষ শুরু করলেন। ২০০৪ এর শেষ দিকে ১৫ হাজার টাকা খরচ করে মেলিফেরা মৌমাছির বাক্স কিনলেন। গত এক বছরে এখান থেকে মোট মুনাফা হয়েছে প্রায় ষাট হাজার টাকা।

অনেককে সাথে নিয়ে অনেক দূরের পথে

আত্মকর্মসংস্থানে নিজের সফলতা উদ্দীপ্ত করে আয়েশাকে। এলাকার অন্য নারীদের কথা চিন্তা করেন। পল্লী গ্রামের পিছিয়ে থাকা দরিদ্র নারীদের এগিয়ে নিতে হলে প্রথমেই তাদের আর্থিক ভিত্তি গড়ে তোলা – এমন ভাবনা থেকেই শুরু হয় গ্রামের

নারীদের সাথে আলোচনা। উজ্জীবক প্রশিক্ষণ থেকে পাওয়া চেতনা কাজে লাগিয়ে নিজের অর্জিত সফলতা আয়েশাকে অন্যদের বিষয়ে আশাবাদী করে তোলে। একই চেতনায় এলাকার নারীদের উজ্জীবিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন তিনি। এমতাবস্থায় প্রথমে মার্চ, ২০০১-এ ৫৮তম ব্যাচে ৬০ জন নারী এবং পরবর্তীতে মার্চ, ২০০৫-এ ৬২৯তম ব্যাচে ৭৫ জন নারী-পুরুষকে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় উজ্জীবক প্রশিক্ষণ প্রদান করলেন।

তার নেতৃত্বে ইতোপূর্বে গড়ে তোলা নারী সংগঠনের সদস্যদেরকে বাঁশ, বেত, মাটির কাজ প্রভৃতি শেখাতেন নিজেই, সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে। সদস্যদের পাঁচ টাকা করে মাসিক চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে সঞ্চয় গড়ে ওঠে। প্রশিক্ষিত সদস্যগণ সঞ্চয়ের টাকা ব্যবহার করে কাঁচামাল কিনে নিজেরা বিভিন্ন জিনিস তৈরি করা শুরু করেন। আস্তে আস্তে তাদের আয় বাড়তে থাকে। সংগঠন সৃষ্টির পর থেকে এ পর্যন্ত ৪০০ নারী প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এদের মাঝে ৬০ জন নারী ইতোমধ্যে ১,০০০-২,০০০ টাকা পর্যন্ত মাসে আয় করছেন। প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে আয়েশা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও বিশ্ব খাদ্য সংস্থার সহযোগিতা নিয়েছেন। উজ্জীবক প্রশিক্ষণের চেতনা এবং আয়েশার সৃজনশীল নেতৃত্বে বর্তমানে সমিতির বেশিরভাগ সদস্য আত্মনির্ভর হয়েছেন। ৭৯ জনকে পাঁচ হাজার টাকা করে ঋণ দিয়েছেন। তারা হাঁস-মুরগী পালন, সেলাই কাজ, মোড়া বানানো, মৌ-চাষ, বাগান ও ছাগল-ভেড়া-গরু পালন ইত্যাদি কাজ করছেন।

এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হনুফা আক্তার নিজে পাঁচ শত সেগুন গাছের একটি বাগান করেছেন – যার বয়স এখন চার বছর, খোদেজার আছে ১০টি ভেড়া, ৩টি গাভী ও হাঁস-মুরগী, এ থেকে বছরে ১৫/২০ হাজার টাকা আয় হয়। সাবিনা ৫০টি হাঁস, ৪০টি মুরগী ও মৌ-চাষ করছেন। এমনি ভাবে ফরিদা, রিনা, কমলা, মাছিদা, খুকি, বলকিস, খালেদা, লাইলি, রহিমা, ফাতেমা, জবেদা, শরিফা, নিলুফা, আফরোজা ও আসমানীসহ অনেকেই উপার্জন করছেন। আত্মনির্ভরশীলতার পথে এগিয়ে যান আয়েশা। টানা দশ বছর স্বামীকে নিয়ে বাবার বাড়িতে থাকার পর গ্রামে গিয়ে স্বামীর বাড়িতে থাকা শুরু করেন। নিজের উপার্জনে বাড়ি তৈরি করে বর্তমানে সেখানে থাকছেন।

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে অব্যাহত লড়াই

নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা, ছোটবেলায় মাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া, এলাকার নারীদের অবস্থা প্রভৃতি ঘটনা তাকে ভাবাত ছোটবেলা থেকেই। গ্রাম এলাকার নারীদের নির্যাতনের ঘটনায় তিনি নিজের সাধ্যমত প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছেন, চেষ্টা করেছেন সামাজিকভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলে প্রতিটি নির্যাতনের বিচার নিশ্চিত করার। অনেক ক্ষেত্রেই এলাকার মানুষকে সংগঠিত করা সম্ভব হয় নি। এরকম বাস্তবতাতেও পিছিয়ে যান নি আয়েশা। নিজের সীমিত সামর্থ আর অদম্য মনোবলকে পুঁজি করে শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়েছেন একা একা। নারী নির্যাতন বিরোধী লড়াইয়ের অসংখ্য দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছেন মুক্তাগাছার প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে।

তখন ২০০১ সাল। ময়মনসিংহ থেকে বাসে মুক্তাগাছায় ফিরলেন আয়েশা আক্তার। বাসের সহযাত্রীদের আলোচনা থেকে শোনেন তার বাড়ি থেকে পাঁচ মাইল দূরে গোদাপাড়া গ্রামের এক নববধূ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। দরিদ্র পরিবারের ওই গৃহবধূকে স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে এলাকার তিন যুবক রাতে ঘরের দরজা কেটে উঠিয়ে নিয়ে যায়। পাশের সেগুন বাগানে পালাক্রমে নির্যাতন চালায় তার উপর। সংবাদ শুনে যখন বাড়ি ফেরেন আয়েশা তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সারারাত ঘুমাতে পারে নি তিনি। ছটফট করে কাটিয়েছেন ভোরের অপেক্ষায়। সকালবেলা একাই ছুটে যান গোদাপাড়া গ্রামে। গিয়ে দেখেন ঘটনাটি নিয়ে ইতোমধ্যে সালিশ বসেছে। ইউনিয়নের চেয়ারম্যান-মেম্বার, স্থানীয় মাতব্বর ও এলাকাবাসী উপস্থিত হয়েছেন সালিশে। একপাশে বসে সবার আলোচনা শোনেন তিনি।

নির্যাতিত মেয়েটির কোন বক্তব্য না শুনে চেয়ারম্যান তাকেই দোষী সাবস্ত করেন এবং এক পর্যায়ে গালাগালি দেয়া শুরু করেন। উপস্থিত অন্যরাও মৌন সমর্থন দেন চেয়ারম্যানকে। আর নীরব থাকতে পারেনা আয়েশা। তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করেন বিচারের। নির্যাতিত গৃহবধুর পাশে গিয়ে দাঁড়ান তিনি। তাকে অভয় দিয়ে সব খুলে বলতে বলেন। নির্যাতনের বর্ণনা দেওয়ার এক পর্যায়ে মেয়েটি তাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে নিজের শরীরের নির্যাতনের চিহ্ন দেখায়। তার সত্য প্রকাশে এবং নারী

হয়েও আয়েশার এই স্পর্ধায় প্রচণ্ড খেপে উঠেন চেয়াম্যান। চিৎকার চেচামেচি করে সবাইকে চলে যেতে বলেন। ভেঙ্গে যায় সালিশ। মেয়েটিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন আয়েশা এবং থানায় গিয়ে মামলা দায়ের করেন। রাতের বেলা পুলিশ নিয়ে গোদাপাড়া গ্রামে গিয়ে নিজেই দৌড়ে ধরে ফেলেন এক ধর্ষককে। নানা প্রলোভনেও আপোস করেন নি তিনি। মামলাটি এখনো আদালতে বিচারাধীন।

মুক্তাগাছার চানপুর গ্রামে ২০০৩ সালের ঘটনা। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে এলাকার তিন বখাটে যুবক পাঁচ বছর বয়সী একটি মেয়ে উঠিয়ে নিয়ে যায় পাশের কলাবাগানে। বাড়ির লোকেরা কিছুক্ষণ পর রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে শিশুটিকে। খবর পেয়ে ছুটে যান আয়েশা। ময়মনসিংহের হাসপাতালে নিয়ে যান মেয়েটিকে, থানায় গিয়ে মামলা দায়ের করেন। মামলায় আটক দুই ধর্ষক এখানো হাজত বাস করছে।

আয়েশার পেছনের দিনগুলোতে এ ধরনের আরও অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। নারী নির্যাতনের প্রতিবাদ করার পাশাপাশি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত করার ফলে প্রতিটি ঘটনাই এলাকায় ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এলাকার সাধারণ মানুষেরা তাকে সমর্থন করছে, ঐক্যবদ্ধ হয়েছে নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং বিচারের দাবিতে। এর ফলে একদিকে যেমন শাস্তি পেয়েছে নির্যাতনকারীরা, নির্যাতন পরবর্তী সামাজিক নিপীড়ন থেকে রক্ষা পেয়েছে নির্যাতিতরা, তেমনি অন্যদিকে নারীদের সম্পর্ক যে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী প্রচলিত রয়েছে তা অনেক ক্ষেত্রেই পরিবর্তিত হয়েছে। একজন সাহসী নারীর নেতৃত্ব এলাকার নারী ও পরুষদের আশাবাদী করে তোলে। আয়েশার অব্যাহত লড়াইয়ের ফলে নারীদের ভয়-জড়তা ভেঙ্গে গেছে। নারী নির্যাতনের ঘটনাও হ্রাস পেয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে।

এ পথেই এগিয়ে যাবে গ্রাম বাংলার নারীরা

গ্রাম প্রধান বাংলাদেশে অধিকাংশ মানুষের উপর শহরের প্রগতিশীল নারী আন্দোলনের ছাপ পড়ে সামান্যই। প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকার নারীদের তাই প্রতিদিন এগিয়ে যেতে হয় কঠোর সংগ্রাম করে। পশ্চাদপদ পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার চাপে সে সংগ্রামও বিপদসংকুল। তারপর থেমে নেই নারীরা। তাদেরই একজন হয়ে মুক্তাগাছার আয়েশা আক্তার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি স্বপ্ন দেখেন, তার এলাকার সকল নারীই এক সময় আত্মনির্ভরশীল হবে। এবং এর মাধ্যমে পরিবারে ও সমাজে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। আত্মনির্ভরশীল নারীরাই নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। আয়শার প্রত্যাশা নিয়ে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন, অনেক ক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন ইতোমধ্যে। আমাদের বিশ্বাস গ্রাম বাংলার নারীরা এভাবেই জেগে উঠবে, নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে কঠোর সংগ্রামে। গড়ে উঠবে সমতার সুন্দর বাংলাদেশ।

চন্দ্রা রাণী সরকার, কিশোরগঞ্জ

আসমা আইয়ুব বেবী

ইচ্ছে ছিলো সাইকেল চালানো শিখবে, এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে ঘুরবে। শিখতেও শুরু করল বাড়ির সামনের মাঠে। কিন্তু সমাজ তা মানবে কেন? সমাজের সেই প্রাচীনপন্থী বিচারে মেয়েটির সরল, নিরাপরাধ, যৌক্তিক ইচ্ছাটিই বড় বেপরোয়া ঠেকল। বাবার কাছে অভিযোগ আসল – মেয়ে উচ্ছন্নে যাবে। বন্ধ হলো সাইকেল চালানো। কিন্তু ঘটনাটি ভাবিয়ে তুলল চন্দ্রা রাণী সরকারকে। সমাজের অন্যায়, অযৌক্তিক সিদ্ধান্তগুলোকে নির্বিকারভাবে মেনে নেয়া যাবে না – এই বোধ তাকে তাড়িত করেছে সব সময়। আত্মনির্ভরশীল হওয়ার চেষ্টায় একাগ্র চন্দ্রা তার ভাবনাকে ছড়িয়েছেন কিশোরগঞ্জের ধনকাড়া থানার হোসেনপুর গ্রামের আরো দশজনের মাঝে।

ধনকাড়া গ্রামটি কোন উন্নত এলাকা নয়। ব্যবসা ও কৃষিই মূলত প্রধান পেশা। শিক্ষার হার খুবই কম, বিশেষত মেয়েদের ক্ষেত্রে। হাতে গোনা তিন চারটি পরিবারের মেয়েরা পড়াশুনা করত। বিদ্যুৎ নেই। সব মিলিয়ে নিতান্ত একটি অনগ্রসর এলাকা। চন্দ্রার জন্ম মধ্যবিত্ত পরিবারে। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। এসএসসি পাশ করার পর ফুপুর বাড়ি ময়মনসিংহ চলে আসেন। আনন্দমোহন কলেজে শিক্ষা জীবন শুরু হয়। এ সময় তিনি ছাত্র ইউনিয়ন, উদীচী ও মহিলা পরিষদের সাথে যুক্ত হন। বই পড়ার অভ্যাস ছিল, অনেক ক্ষেত্রেই অন্য আর দশটা মেয়ের থেকে চিন্তার ভিন্নতা ছিল, তবে রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে হওয়ায় হোস্টেলে থাকা হয় নি। বাড়ি থেকে বের হওয়াও নিষিদ্ধ ছিল। পদে পদে ঘটে যাওয়া এ ঘটনাগুলো চন্দ্রার মধ্যে এক ধরনের যন্ত্রণা তৈরি করে। কিন্তু বসে থাকার মেয়ে নয় চন্দ্রা সরকার।

আর্থিক সচ্ছলতা তৈরি হলে হয়তো তার পরাধীনতা অনেকাংশে লাঘব হবে– এমন ভাবনায় ৮৮ সাল থেকে লেখাপড়ার পাশাপাশি ওয়ার্ল্ড ভিশনে ১,৫০০ টাকা বেতনে পার্টটাইম কাজ শুরু করেন। সেই সাথে আরো তিনটি টিউশনী করে মাসে আরো ১,০০০ টাকা আয় করতেন চন্দ্রা। নিজের পড়াশুনার খরচ চালিয়ে কিছু টাকা জমান সে সময়। ৯০ সালে বিএ পড়ার সময় যুব উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় চন্দ্রা ও তার পাঁচ জন বান্ধবী হস্তশিল্প এবং সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তার ও বন্ধুদের সামান্য পুঁজি দিয়ে তারই উদ্যোগে ৯১ সালে অগ্রদূত নামে একটি স্থানীয় উন্নয়ন সংগঠন গড়ে তোলেন। সেখানে সামান্য টাকার বিনিময়ে দুঃস্থ মেয়েদের সেলাই প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হল। অংশগ্রহণকারীরা তাদের তৈরি বিভিন্ন ধরনের জিনিস বাজারে বিক্রি করে আয় করতে শুরু করে। ধীরে ধীরে সংগঠনের কাজের পরিধি বাড়তে থাকে।

১৯৯২ সালে চন্দ্রা ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযোদ্ধা স্কুলে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসাবে কাজ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার ২২ জন মেয়ের অংশগ্রহণে অগ্রদূতের একটি শাখা গঠন করেন। নকশী কাঁথা, বেড কভার, সোফার কভার এবং পাপোষ তৈরি শুরু করেন তারা। পরবর্তীতে ময়মনসিংহে তাদের পরিচিত একজন ব্যক্তি শামসুদ্দিন কানাডায় নকশী কাঁথা পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। এর মাধ্যমে তাদের বেশ কিছু আয় হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তাদের কাজের পরিধিতে সন্তুষ্ট হয়ে সংগঠনের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করে এবং তার কাজের স্বীকৃতি হিসেবে সার্টিফিকেট প্রদান করে। একজন সফল নারী উদ্যোক্তা হিসেবে বাংলাদেশ টেলিভিশন চন্দ্রার সাক্ষাতকার প্রদান করে এ সময়।

বিএ পাস করার পর ১৯৯৩ সালে ময়মনসিংহের হাজী জালাল উদ্দিন প্রি-ক্যাডেট উচ্চ বিদ্যালয়ে চন্দ্রা শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। স্কুলের প্রিন্সিপাল ছিলেন অসৎ চরিত্রের মানুষ। চন্দ্রা অবিবাহিত হওয়ার কারণে তাকে বিভিন্নভাবে উত্যক্ত করার চেষ্টা করেন এবং খারাপ প্রস্তাব দেন। বিভিন্ন সময়ে অপমান ও ঝামেলার পরও তিনি চাকরিটি করছিলেন, কারণ এমএ পড়ার খরচ চালানোর জন্য তার অর্থের প্রয়োজন ছিল। প্রিন্সিপালের প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় চন্দ্রাকে বড় ক্লাস থেকে ছোট ক্লাসে পড়াতে বাধ্য করা হয়। খুব সামান্য বিষয়ে অনেক মানুষের সামনে অকথ্য ভাষায় বকাঝকা করতেন প্রিন্সিপাল। সকল শিক্ষক যেসব সুযোগ সুবিধা পেতেন তা থেকে তাকে বঞ্চিত করা হত। অবশেষে আর সহ্য করতে না

পেরে চাকরিটি ছেড়ে দিলেন। এঘটনায়ও ভেঙে পড়েন নি চন্দ্রা। ব্র্যাকে 'ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন প্রকল্পে' কাজ নিলেন। বদলি চাকরি হওয়ায় পরিবার থেকে তা মেনে নেয় নি। এর ফলে এই চাকরিও তাকে ছেড়ে দিতে হয়।

চন্দ্রাসহ আরও পাঁচ জন অগ্রদূতের পরিচালনাকারী থাকলেও চাকরি আর বিয়ের কারণে এক সময় অগ্রদূত থেকে চলে যায় সকলেই। অগ্রদূতের একমাত্র কাণ্ডারী তখন চন্দ্রা। ১৯৯৮ সালে কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে সার্কুলার দেখে আবেদন করেন। শিক্ষক পদের জন্য মনোনীত হয়ে চন্দ্রা সেখানে যোগদান করেন। তিনি ময়মনসিংহে অগ্রদূতের দায়িত্ব বেলা রাণী সরকারকে দিয়ে করিমগঞ্জে চলে যান। নারীদের স্বাধীনতার ব্রত নিয়েছেন তিনি, এ কাজ থেকে পিছিয়ে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

করিমগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে মেয়েদের হোস্টেলে একটি রুমে চন্দ্রার থাকার ব্যবস্থা হয়। ইতোমধ্যে তিনি করিমগঞ্জে বিভিন্ন মেয়ের সাথে যোগাযোগ করেন এবং ২৩ জন মেয়ে নিয়ে অগ্রদূতের কার্যক্রম শুরু করেন। কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি রুম ভাড়া নেয়া হয়। প্রথমে মেয়েদের যৌতুক, বাল্যবিবাহ বিভিন্ন অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। নকশী কাঁথা আর সেলাইয়ের কাজ শিখিয়ে তিনি অগ্রদূতের কাজ শুরু করেন। তিন বছর অগ্রদূত করিমগঞ্জে নারীদের সংগঠিত ও সাবলম্বী করে। ইতোমধ্যে কাজের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে। ২০০১ সালে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে অগ্রদূত রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করে। করিমগঞ্জে অগ্রদূতের সদস্য বর্তমানে ৯২ জনে দাঁড়িয়েছে। তারা সকলেই এলাকাভিত্তিক উপার্জন করছে। অগ্রদূতের মোট কর্মী বর্তমানে ১৫০ জন। প্রত্যেকে মাসে ৫০ টাকা সঞ্চয় করে তারা। বর্তমানে তাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬৬,০০০টাকা।

করিমগঞ্জ থানার পানাহার গ্রামে প্রগতিশীল মানসিকতাসম্পন্ন সুব্রত কিশোর রায়ের সাথে ১৯৯৯ সালে চন্দ্রার বিয়ে হয়। অন্যান্য দশটা মানুষ থেকে তাদের দু'জনের চিন্তাভাবনা ভিন্ন হওয়ায় কাজের ক্ষেত্রে কোন ধরনের ছেদ ঘটে নি চন্দ্রার, বরং বিভিন্ন কাজ আরও উদ্যম নিয়ে শুরু করেন। একই বছর করিমগঞ্জে মহিলা পরিষদের একটি শাখা গঠন করেন। মেয়েদের প্রশিক্ষিত করা আর একই সাথে তাদের অধিকার সচেতন করার মাধ্যমে করিমগঞ্জ এলাকায় তার পরিচিতি এবং গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হয়।

করিমগঞ্জে একটি এনজিও-এর কর্মী সুমিতা রাণী মোদককে অন্যায়ভাবে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। তাকে সপ্তাহে সাত দিন কাজ করতে হবে, কোন সাপ্তাহিক ছুটি থাকবে না– এ প্রস্তাব মেনে নিতে সুমিতা অস্বীকৃতি জানানোর ফলে এ ঘটনা ঘটে। সুমিতা বিষয়টি চন্দ্রাকে জানায়। অগ্রদূত ও মহিলা পরিষদের পক্ষ থেকে চন্দ্রা এনজিওটির অফিস প্রধানের সাথে কথা বলেন। প্রথমে তারা বিষয়টিকে কোন প্রকার গুরুত্ব দেয় নি। চন্দ্রা কর্তৃপক্ষকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, বিষয়টির সুরাহা না হলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকবে না। একজন নারী বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবে এবং তাতেই কর্তৃপক্ষকে সিদ্ধান্ত পাল্টিয়ে ফেলতে হবে– এটি 'পুরুষ' পরিচালকের ঠুনকো আত্মমর্যাদায় বাধে। একজন মেয়ে হয়ে সংগঠনের তেমন কোন ক্ষতি করতে পারবে না– এই বোধ থেকে তারা চন্দ্রার কথাকে তেমন গুরুত্ব দেয় না। বিষয়টির সুরাহা না করায় সকল রাজনৈতিক নেতা, নারী সংগঠন, সাংবাদিক, বিশেষ ব্যক্তিত্ব ও সাধারণ মানুষসহ প্রায় ৩৫০ জন চন্দ্রার নেতৃত্বে এনজিও অফিস ঘেরাও করে সকল কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। তাদেরকে ৪৮ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয় এবং এর মাঝে দাবি মেনে না নিলে দীর্ঘ দিনের জন্য কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। এ আন্দোলনের ফলে এনজিও'র পরিচালক তাদের কাছে ক্ষমা চায় এবং চার ঘণ্টার মধ্যে সুমিতা রাণী মোদককে তার স্থানে পুণর্বহাল করে। নারীরা প্রতি পদে পদে এ ধরনের মানসিক নিপীড়নের শিকার হচ্ছে, কিন্তু চন্দ্রাদের মতো নারীরা একবার যখন নিপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে শুধুমাত্র তখনই নিপীড়িতদের পক্ষে বিজয় অর্জন সম্ভব হয়েছে।

বিভিন্ন ইস্যুতে ন্যায্য অধিকার আদায়ে সক্রিয়তার ফলে এলাকায় চন্দ্রার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় আর সেই সাথে কাজের পরিধিও বিস্তৃত হতে থাকে। এরই মাঝে ২০০৪ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক সাদিক আহ্মেদ স্বপন চন্দ্রাকে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ নেয়ার প্রস্তাব দেন। শুরুতে চন্দ্রার নিজের প্রশিক্ষণ নেয়ার ইচ্ছা ছিল না, অন্যদিকে পরিবারও তাকে

নিরুৎসাহিত করে। পরবর্তীতে ৭৩৫তম ব্যাচে প্রশিক্ষণ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। প্রশিক্ষণ শেষে চন্দ্রার উপলব্ধি "আমি একজন আত্মনির্ভরশীল মানুষ। এলাকার মানুষ, বিশেষ করে নারীদের অধিকার আদায়ের জন্য বিভিন্ন কাজ করলেও উজ্জীবক প্রশিক্ষণ নেয়ার পর বর্তমানে আমি একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুপ্রেরণা নিয়ে এলাকার সকল মানুষের উন্নয়নের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করার প্রস্তুতি নিচ্ছি।" নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগঠিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় 'আলোর পথে' নামে ২২ সদস্য বিশিষ্ট একটি উজ্জীবক মহিলা সমিতি গঠন করেন। দক্ষ নেতৃত্ব গড়ে না ওঠা পর্যন্ত চন্দ্রাকে ভারপ্রাপ্ত সভানেত্রীর দায়িত্ব দেয়া হয়। প্রত্যেকে মাসে ২০ টাকা করে চাঁদা জমানো শুরু করে উজ্জীবকরা।

করিমগঞ্জের মধ্যপাড়া ও আসুতিয়া পাড়ায় চন্দ্রা দু'টো সেলাই প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন এবং নিজেই প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। বর্তমানে মধ্যপাড়ায় ৩৫ জন ও আসুতিয়া পাড়ায় ৫২ জন সেলাই প্রশিক্ষণার্থীকে নিয়ে দু'টি সমিতি তৈরি করেছে। মধ্যপাড়ার নারী সদস্যগণ অগ্রদূত থেকে লোন নিয়ে চারটি সেলাই মেশিন কিনেছে এবং কাজ করছে। এ ছাড়াও চন্দ্রা অসহায় নারীদের স্বাবলম্বী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। অনিতার কথাই ধরা যাক। ২০০৩ সালে অনিতাকে ৬ মাসের গর্ভবতী অবস্থায় রেখে তার স্বামী মারা যায়। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য অগ্রদূতে সেলাইয়ের কাজ শেখান। স্থানীয় এনজিওতে কাজের ব্যবস্থা করে দেন। বেতনের টাকা অল্প অল্প করে জমিয়ে অনিতা সেলাই মেশিন কিনে এলাকার মানুষের কাপড় সেলাই করে প্রতিদিন প্রায় ১৫০ টাকা আয় করেন। এভাবে অনিতার জীবন বদলে যায়। চন্দ্রা ২০০৫ সালে ৮০৫তম ব্যাচে অনিতাকে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ নিতে উৎসাহিত করেন। এই প্রশিক্ষণে তার চিন্তা-ভাবনার কিছু পরিবর্তন ঘটে। তিনি আর বাসায় বসে নয় 'ভাই ভাই টেইলার্স' নামক একটি দোকানে কাজ করেন। বর্তমানে প্রতিদিন ২৫০ টাকা আয় করেন। এখনও অন্যের বাড়িতে আশ্রিতা হিসাবে আছেন। অল্প অল্প টাকা জমিয়ে ভবিষ্যতে জমি কেনার ইচ্ছা আছে। একই ব্যাচে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ নেন আসমা ও নাসিমা। চন্দ্রা তাদের কাজ করতে এবং স্বাবলম্বী হতে উৎসাহিত করেন। অগ্রদূত আসমাকে ৩,৫০০ টাকা ও নাসিমাকে ৫,০০০ টাকা ঋণ দিয়েছে সেলাই মেশিন ও কাপড় কেনার জন্য, যা ৪০০ টাকা করে কিস্তিতে শোধ করছেন। এখন তারা সাবলম্বী। এভাবেই নিরন্তর প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে চন্দ্রা অসহায় নারীদের সাবলম্বী করার ক্ষেত্রে কাজ করে চলছেন।

গত ২৭ ডিসেম্বর, ২০০৫ সালে সবিতা রাণী নামক একজন মহিলাকে তার জা, ভাসুর আর স্বামী মেরে রক্তাক্ত করে ঘরে বন্দি করে রাখে। চন্দ্রা সেই সময় স্কুলে ছিলেন। গ্রামবাসী চন্দ্রাকে খবর দেয়ার সাথে সাথে তিনি মোদক পাড়ায় চলে যান। এলাকার লোকজন নিয়ে সবিতাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে দেন। এ ঘটনার বিচারের জন্য সালিশের আয়োজন করেন। সালিশে সবিতাকে যাতে পরবর্তীতে আর নির্যাতনের শিকার হতে না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য সবিতার নামে এক খণ্ড জমি লিখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। বিচারের রায় তারা মেনে নিল। কিন্তু পরবর্তীতে এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সহযোগিতায় সবিতার স্বামী এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান এবং তার পরিবার রায় অমান্য করে। সবিতা হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে চন্দ্রার বাসায় আশ্রয় নেন। চন্দ্রা সহায়তায় সবিতা ন্যায় বিচারের প্রত্যাশায় ভাসুর, জা আর স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করেন। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। আটক থাকা অবস্থায় সবিতার নামে জমি লিখে দিয়ে এবং স্ত্রীর উপর নির্যাতন না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জামিনে মুক্তি পান সবিতার স্বামী। বিষয়টি বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে তার এলাকাসহ সারা দেশে ব্যাপক আলোড়ন তৈরি করে।

নারী নির্যাতনের এ ধরনের দু-চারটি ঘটনা কাহিনী প্রকাশিত হয়, আর বহু ঘটনাই রয়ে যায় অন্তরালে। নারীদের সাহস আর আত্মবিশ্বাসের উপর ভর করে গড়ে ওঠা প্রতিবাদ আন্দোলনের সফলতা অন্যদেরকে প্রেরণা জোগায়। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কিশোরগঞ্জের চন্দ্রা সরকার যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তার ধারাবাহিকতায় অন্তরালের ঘটনাগুলোও বাইরে বেরিয়ে আসবে, সংগঠিত হবে সামাজিক প্রতিরোধ, গড়ে উঠবে নারী-পুরুষ বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ– এটাই চন্দ্রার প্রত্যাশা।

সাগর পাড়ের সংগ্রামী নারী

আলী উমেদ

মানুষ জন্মায়। স্বাভাবিকভাবেই জন্মায়। অপার সম্ভাবনা নিয়ে জন্মায়। জন্মের পরে আবার এক সময় মরেও যায়। এরই মধ্যে কেউ কেউ নিজের, পরিবারের, সমাজের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে প্রতিকূল পরিবেশকে নিয়ে আসে অনুকূলে। তাদের আলোকময় শোভা অন্যকে পথ দেখায়; হৃদয়ের প্রবল সাহস ও শক্তি অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। ক্রমে ক্রমে মানুষের বিচ্ছিন্ন সুপ্ত ইচ্ছাগুলো, অন্ধকারে আচ্ছাদিত আকাঙ্ক্ষাগুলো এই আলোকিত মানুষটিকে কেন্দ্র করে পথ খুঁজে পায়। এমন সম্ভাবনা সকলেরই থাকে। কিন্তু সুদৃঢ় আত্মপ্রচেষ্টা ও সুকৌশল আশ্রয়ী মানুষই পৌঁছে যায় সফলতার দ্বারপ্রান্তে । বৃহৎ এবং স্বল্প – উভয় পরিসরেই একথা সত্য। এই গৌরচন্দ্রিকা যার উদ্দেশ্যে তিনি মাসুদা বেগম। মোহাম্মদপুরের ৩/৭ আসাদ এভিনিউ-এর ৫ তলায় জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক তিনদিন ব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অংশগ্রহণকারী একজন নারী নেত্রী মাসুদা বেগম। প্রশিক্ষণটির আয়োজক দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ। প্রশিক্ষণের শেষদিনের শেষ বিকেলে মাসুদা বেগমের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, কথা হয়। বর্তমানে তিনি চট্টগ্রামের সিতাকুণ্ড পৌরসভার কমিশনার ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান।

দীর্ঘ অবয়ব, তামাটে শরীর। বলিষ্ঠ বাচনভঙ্গির সমান্তরালে চোখ দু'টিও কথা বলে। পোশাকে ও আভরণে বাহুল্যের কোন ছাপ নেই। প্রান্তিক নারীর সংগ্রামবহুল জীবনের এই বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব যে কাউকে আকৃষ্ট করবে। দেখলেই মনে হয় সুদীর্ঘকাল স্রোতের উজানে পথ চলে সুস্থিরভাবে হাল ধরে পথ চলছেন মাসুদা বেগম। বয়স চল্লিশ। বড় ছেলে এমএ পরীক্ষার্থী, ছোটটি ক্লাস এইটে। বিবাহিত বড় মেয়ে বিকম পাশ, ছোট মেয়েটি বিএ অনার্স পড়ছে। অন্যদিকে এদেরই মা মাসুদা বেগম প্রবল চেষ্টা করেও পিতৃকুল ও স্বামীকুলের অধিক প্রবল অসহযোগিতার কারণে তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও এসএসসি পরীক্ষাটি পর্যন্ত দিতে পারেন নি। অথচ দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া মাসুদা তৃতীয় শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সর্বদাই ছিলেন ক্লাসের ফার্স্ট গার্ল। কৈশরের স্মৃতি হাতড়ে দুঃখভরা মন নিয়ে জানালেন, অসুস্থতার কারণে কেবল একবার অষ্টম শ্রেণীতে তার রোল হয়েছিল তিন। সেই আপসোস, সেই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা তিনি বাস্তবায়ন করেছেন নিজের সন্তানদের মাধ্যমে।

পাহাড় ও বঙ্গোপসাগরের অতি সন্নিকটে সিতাকুণ্ডের ভাইয়ের খিল গ্রাম। সাগরের অস্থির গর্জন আর অটল পাহাড়ের সর্বংসহা পরিবেশের মধ্যেই ষাটের দশকের মাঝামাঝি অত্যন্ত সাধারণ একটি পরিবারে মাসুদা বেগমের জন্ম। জ্ঞান হওয়ার আগেই বাবা মারা যান। ভাইদের সংসারে বাবার অভাবটা থেকেই যায়। কিন্তু এসব বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি তার জীবনে। শুধু লেখাপড়ায় নয়, দুরন্তপনায় ও কর্মদক্ষতায়ও মাসুদা ছিলেন সবার সেরা। নাচ, গান, হাডুডু, বউছি সবমিলে এক দুরন্ত চৌকশ কিশোরীর চঞ্চল ছবিই আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার বর্ণনায়। মাসুদার চাচা ও বড় ভাইয়েরা প্রায়ই বলতেন,"মাসুদা মেয়ে না হয়ে ছেলে হলে বংশের মান সম্মান বাড়াতো"। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের এই প্রচলিত নিয়মের বাইরে মেয়ে হয়েও মাসুদা পরবর্তী জীবনে বংশের মান বাড়িয়েছেন ঠিকই।

সেই বয়সেই মাসুদা ভাবী ও বোনের নিকট থেকে সেলাই ও কুশিকাটার কাজ শিখেছিলেন। সবমিলে গ্রামের সাধারণ পরিবারে এমন মেয়ে হাজারে একটাও জোটেনা। কিন্তু এই সম্ভাবনাময়ী ক্ষুদে প্রতিভার মুক্ত জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায় রক্ষণশীল সমাজের এক আচমকা ঝড়ে। অভিজাত নয়, সাধারণ পরিবারের পিতৃহীন মেয়েকে লেখাপড়া করিয়ে কি হবে? বন্ধ হয় তার স্কুল। ফতোয়াবাজ মাতুব্বর আর দায়গ্রহণে অনাগগ্রহী ভাইদের চাপে বিয়ে হয়ে যায় মাসুদা বেগমের। ভাইয়ের খিল গ্রামের ডানপিটে স্বভাবের দুরন্ত কিশোরী হঠাৎ করেই প্রবেশ করে উত্তর ইদিলপুরের এক রক্ষণশীল পরিবারে। স্বামী মোঃ আবুল খায়ের ছোট খাটো ঠিকাদারির কাজ করতেন। তুলনামূলকভাবে উদার পারিবারিক পরিবেশ থেকে চরম রক্ষণশীল পরিবারে মাসুদার দুরন্ত স্বভাবের কারণেই মাসুদা গৃহীত হন নিগৃহীতভাবে।

অত্যন্ত বেদনাভরা কণ্ঠে কিছুটা পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে মাসুদা বর্ণনা করছিলেন ২৫ বছর পূর্বের সংসার জীবনের যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতার কথা: "আমার বাবার বাড়িতে ডাক্তারের মাধ্যমে টিকা দেয়া একটি দরকারি ও স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। অথচ বিয়ের পরপরই শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে যখন টিকা দেই- তা আমার শ্বশুর শাশুড়িসহ সবার নিকট কবিরা গুনার সমান অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়। স্বামী আমাকে ভালবাসত। কিন্তু টিকা দেওয়ার ঘটনায় পরিবারের প্রভাবে স্বামী আমাকে এমন প্রহার করেছিলেন যে হালের দুষ্ট বলদকেও মানুষ বোধ হয় অতটা প্রহার করে না"। এসবের জন্য আজ আর কষ্ট হয় না মাসুদার, কষ্ট হয় না শ্বাশুড়ির অত্যাচারের কথা মনে পড়লেও। মাসুদাকে সে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিত ক্ষুধার্ত রেখে। স্বামীর সঙ্গে সর্ম্পকটা সবসময়ই অম্লমধুর। স্বামীটি রক্ষণশীল পুরুষ হিসেবে 'বউ পেটায়', মানসিক যন্ত্রণা দেয়, সর্বদাই শ্বশুর-শ্বাশুড়ির বউ সম্পর্কিত নালিশে কান দেয় ও তাল দেয়। তারপরও দু'জনের একটা টান-ভালবাসার কথা লাজুক লাজুক ভঙ্গীতে জানালেন মাসুদা- যা তার বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল।

আমি মাসুদা বেগমের দুরন্তপনার কথা জেনে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তিনি সাইকেল চালাতেন কিনা। সাইকেল চালাতেন। ট্রাই সাইকেল অর্থাৎ রিক্সা চালানোর অভিজ্ঞতাও আছে। সে চিত্র দাম্পত্য জীবনের একটি ভিন্ন মাত্রিক চিত্র। মাসুদার ভাষায়,"ফাল্গুন মাসের এক জোছনা রাতে স্বামীর সাথে হাঁটছিলাম। রাত তখন আনুআনিক ১১ টা হবে। রাস্তার ধারে খোলা জায়গায় অনেকগুলো রিক্সা পার্ক করা। একটি রিক্সায় ড্রাইভিং সিটে বসে স্বামীকে বানালাম প্যাসেঞ্জার। অনেকক্ষণ রিক্সা চালিয়েছিলাম। জোছনা রাতের এই অন্যরকম অভিজ্ঞতায় আমরা দুজনই আবেগী হয়ে পড়েছিলাম। স্বামীকে রিক্সায় ঘোরানোর এই মধুময় অভিজ্ঞতা আমি কখনোই ভুলতে পারি না।"মাসুদা এখন অনেক পরিণত। অনেক বোঝেন। কথা বলেন মানব জীবন পাঠ করা একজন অভিজ্ঞ ছাত্রের মত। কথার চেয়ে কাজের প্রতি তার আগ্রহ অধিক।

শুধু রিক্সার ব্রেক ধরা নয় স্বামীসহ গোটা পরিবারের হালই ধরতে হয়েছিল মাসুদাকে। বিয়ের পর স্বামীর ঠিকাদারী কাজ চলে যায়। সংসারে নেমে আসে প্রবল আর্থিক সংকট। হতাশায় ভেঙ্গে পড়েন স্বামী। অভাবের কারণে বাংলাদেশের সমাজের আর দশটা পরিবারের মতো মাসুদার ওপরও বেড়ে যায় অত্যাচার। কিন্তু বিরূপ সময়েও সঠিক সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করেন মাসুদা। শুরু করেন ছাত্র পড়ানো। ভালো ছাত্রী হিসেবে তার সুনাম ছিল। ছাত্র পড়ানোর পাশাপাশি পুরনো অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করেন সেলাই ও কুশিকাটার কাজ। এ সময় স্বাস্থ্যকর্মী পদে চাকুরীর হাত বাড়িয়ে দেয় কেউ কেউ। দারুণ প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও পরিবারের রক্ষণশীল মনোভাবের বাধায় মাসুদা চাকুরিতে যোগদান করতে পারেন নি। ইতোমধ্যে দু'টি সন্তান চলে এসেছে মাসুদার সংসারে। ফলে ভবিষ্যত অনিশ্চয়তা আর অভাব অস্থির করে তোলে মাসুদাকে। দৃঢ় মনোবল, অটল সাহস আর কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে পার করে দেন ১০টি বছর। অমসৃণ বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে পোড় খাওয়া জীবনে অর্জিত হয় অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতাই তার সম্পদ। সেলাই ও এমব্রয়ডারির দক্ষতাকে পুঁজি করে ১৯৯২ সালে নিজের উদ্যোগে সিতাকুণ্ড কথাকলি উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা করেন সেলাই প্রশিক্ষণ সেন্টার। এতদিন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রবলতা নিজের পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যদিও আর্থিক উপার্জনে সক্ষমতার কারণে অত্যাচারের মাত্রা কমে গিয়েছিল কিছুটা।

কিন্তু ঘর ছেড়ে যখনই বাইরে এলেন অর্থাৎ সেলাই প্রশিক্ষণ সেন্টার খুললেন তখনই তৈরি হল প্রচণ্ড বাধা। ঘরে এবং বাইরে উভয় ক্ষেত্রে বাধা। মাসুদা বেগমের কর্মকুশলতা ও সাহযোগিতার মনোভাবের কারণে ইতোমধ্যেই তার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। উদ্বোধনী দিনেই প্রশিক্ষণ সেন্টারের যাত্রা শুরু হয় ৫০ জন ছাত্রী নিয়ে। কিন্তু সমাজবিধি বাম হল মাসুদা বেগমের কাজে। নানান রকম কথা উঠল। "ঘরের বউ বাইরে কেন? মুসলমান ঘরের মেয়ে হয়ে পুরুষের মতো প্রশিক্ষণ সেন্টার চালাবে এটা হতেই পারে না"। মাসুদার স্বামী ও পরিবার এর কোন প্রতিবাদ করলো না। বরং মাতুব্বরদের কথা তাদের সঠিকই মনে হল। উত্তর ইদিলপুরসহ আশেপাশের এলাকায় রক্ষণশীলদের নিকট মাসুদা বেগম অভিহিত হলেন 'বেয়াদব' বলে। প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয় চট্টগ্রামেরই এক কৃতি সন্তান ড. আহমেদ শরীফ 'বেয়াদবী' করাকে ভাল কাজ বলেছিলেন। তিনি বেয়াদবী বলতে অন্যায়ের প্রতিবাদ, বিদ্রোহ, অধিকার আদায়ের জন্য যে প্রতিরোধ ইত্যাদিকে বুঝিয়েছেন। মাসুদা বেগম ঠিক সেই কাজটি করেছেন।

প্রথম যেদিন মাসুদা বেগম ট্রেনিং দেয়ার জন্য কথাকলি উচ্চ বিদ্যালয়ে রওয়ানা দেন– তখন পথিমধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায় গ্রামের মাতুব্বর ও ফতোয়াবাজগণ। মাসুদা বেগমের সঙ্গে প্রচুর তর্ক হয়। অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে একজন বলিষ্ঠ নারী নেত্রীর ভূমিকায় দাঁড়িয়ে যান মাসুদা বেগম। জনগণের সামনে উপস্থিত প্রত্যেকটি মোড়ল ও পুরুষের আসল রূপ উন্মোচন করে দেন। রাগে থর থর করে কাঁপতে থাকেন। সত্য ভাষণের প্রবল শক্তির মুখে তথাকথিত সমাজপতিরা সংকুচিত হয়ে পড়ে। শুরু হয় সিতাকুণ্ড কথাকলি উচ্চ বিদ্যালয়ে সেলাই প্রশিক্ষণ সেন্টার। মাসুদা বেগম যে পরিমাণ আবেগ ও বলিষ্ঠতার সঙ্গে এই ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছিলেন তাতে মনে হচ্ছিল ন্যায় যুদ্ধে সদ্য জয়ী জাহাজের এক পরিশ্রমী ক্যাপ্টেন তার বিজয়ের ও কষ্টকর অভিজ্ঞতার বিবরণ দিচ্ছেন। যাহোক, প্রশিক্ষণ সেন্টারটি বর্তমানেও চালু আছে। মাসুদা বেগমের ছাত্রীরাই বর্তমানে এটি চালায়।

মাঝে দুই বছর মাসুদা বেগম একটি দর্জ্জি বিজ্ঞান কলেজে সুপারভাইজার পদে চাকুরি করেন। ঐ সময়টাতে প্রশিক্ষণ সেন্টার বন্ধ ছিল। প্রশিক্ষণের সফলতার যে শক্তি তার ফলে মাসুদা বেগমের বিচিত্রমুখী উদ্যোগ ও কর্মদক্ষতা আলোর মুখ দেখে।

তিনি যোগ দেন আনসার ভিডিপিতে। গাজিপুরে ট্রেনিং নেন। আনসার ভিডিপিতে দক্ষতা প্রদর্শন করার জন্য ২০০২ সালে পদক, সনদ ও ৫,০০০ নগদ টাকা পুরস্কার পান। এ ছাড়া এই ক্ষেত্রে কর্মতৎপরতার জন্য বিভিন্ন সময়ে সাইকেল, টিভি, রেডিও, সেলাই মেশিন ইত্যাদি পুরস্কার পান। বর্তমানে সিতাকুণ্ডের ৫৭৬ জন আনসার ভিডিপির দলনেত্রী মাসুদা বেগম। আনসার ভিডিপি ছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা রকম কর্মশালা ও ট্রেনিং তিনি গ্রহণ করেন। এর মধ্যে EPI টিকা দান, জন্মনিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ, গবাদি পশু পালন, নার্সারি, নারীর ক্ষমতায়ন, জেন্ডার ইস্যু ইত্যাদি। তার অর্জিত ২০টি সনদ নিজের ঘরে সংরক্ষিত আছে। তার দক্ষতা ও কর্মতৎপরতার বিচিত্র ও বিস্তৃত জগৎ রয়েছে। সিতাকুণ্ড পৌরসভার স্যানিটেশন কমিটির আহ্বায়ক তিনি। উপজেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটি ও মানবাধিকার কমিটির সদস্য। আনসার ভিডিপি সমিতির সভাপতি ছিলেন। উত্তর ইদিলপুর বহুমুখি সমবায় সমিতির সদস্য। সব মিলে সিতাকুণ্ডের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এক জনপ্রিয় উন্নয়ন কর্মী ও নারী নেত্রীর নাম মাসুদা বেগম। এই জনপ্রিয়তার কারণেই তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ২০০২ সালে পৌরসভার কমিশনার নির্বাচিত হন। এবং এক সময় পালন করেন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব। তার জনপ্রিয়তার কারণে নির্বাচনে কোন বিপক্ষ প্রার্থী পাওয়া যায় নি।

এতকিছুর পরেও মাসুদা একজন ব্যবসায়ী এবং আত্মনির্ভরশীল নারী। সিতাকুণ্ড লেডিস মার্কেটে পোষাকের একটি দোকান রয়েছে তার। ২৪টি দোকানের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এই মার্কেটের ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতিও তিনি। বাজারে ৮টি সেলাই মেশিন ও ২টি এমব্রয়ডারি মেশিন নিয়ে একটি টেইলারিং শপ রয়েছে– যেখানে ১০ জন নারী কর্মচারী কাজ করেন। তিনি তার ২০ শতাংশ জমিতে ওষধি, ফলজ ও বনজ বৃক্ষ রোপণ করেছেন। এছাড়া ডেল্টা লাইফ ইনসিওরেন্সে মাসিক ২৫০ টাকার একটি ইনসিওরেন্স রয়েছে।

মাসুদা বেগম তার জীবনের অনেক চড়াই-উৎড়াইয়ের ভেতর থেকে চারটি ঘটনাকে তার উন্নয়নের মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তার প্রথম সন্তানের জন্ম, ১৯৯২ সালে সেলাই প্রশিক্ষণ সেন্টার চালু, ২০০২ সালে পৌরসভার কমিশনার নির্বাচিত হওয়া এবং ২০০৩ সালের একটি মোটিভেশনাল ট্রেনিং।

২০০৩ সালের প্রথম দিকের ঘটনা। নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে মাসুদা বেগম পৌরসভার কমিশনার। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে চলছেন তিনি। পৌরসভার, বিভিন্ন সংগঠনের, ভিডিপির, সেলাই প্রশিক্ষণের এবং নিজের ব্যবসার নানামুখী কাজে তিনি লক্ষ করলেন সমন্বয়ের অভাব। মাঝে মাঝে হতাশ হন, আবার দৃঢ় মনোবলে উদ্যোগী হন। এমনি সময়ে উপজেলা মিলনায়তনে আয়োজন চলে একটি প্রশিক্ষণের। মাসুদা বেগম শুনে অবাক হন যে, এই ট্রেনিং বৃত্তিমূলক নয়, নেই কোন আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও। ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে মানুষের সুপ্ত শক্তির জাগরণ

ঘটানো হয়। এরকম একটি প্রশিক্ষণের অভাব সুদীর্ঘ জীবনে তিনি বার বার অনুভব করেছেন। সুতরাং অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তিনি নিজে, তার স্বামী, ছেলেমেয়ে, পৌরসভার কয়েকজন কমিশনারসহ আরও অনেককে নিয়ে বিপুল উৎসাহে অংশগ্রহণ করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট পরিচালিত ৩০৯তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণে। ট্রেনিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে যান মাসুদা বেগম, বদলে যায় তার কর্মকাণ্ডের ধরন, পরিবর্তিত হয় কৌশল। নিজস্ব কাজের বাইরে জনসেবায়, বিশেষত নারী উন্নয়নে তিনি অধিক মনোযোগী হয়ে ওঠেন।

নারীর ক্ষমতায়নে তিনি নিবিষ্ট মনে কাজ করে চলেছেন। আশ্রয়হীন নারী, অত্যাচারিত নারী, অন্যায়ভাবে তালাকপ্রাপ্তা নারী, বিধবা নারী সকলেই তার নিকট থেকে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা পান। মাসুদা বেগম জানান, এসব কাজে নানা রকম বাধা আসে। কিন্তু সমস্ত বাধা অতিক্রমে তাকে সাহায্য করে প্রধানত দু'টি শক্তি। প্রথমত, পৌরসভার কমিশনার হিসেবে তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশিদার। তার মতে এই শক্তি মূলত জনগণের শক্তি। একে তিনি ব্যাখ্যা করলেন বাইরের শক্তি বলে। দ্বিতীয় শক্তি হচ্ছে অন্তরের শক্তি, হৃদয়ের শক্তি – যে শক্তির যোগান দিয়েছে চারদিনের উজ্জীবক প্রশিক্ষণ। এই শক্তির আশ্রয়ে মাসুদা বেগম সিতাকুণ্ডের উন্নয়নে নিজের শ্রম, মেধা ও সামর্থ্যকে উজাড় করে আত্মনিয়োগ করেছেন।

মাসুদা বেগম অনেক কথা বলেছেন। আমাদের দেশের কুসংস্কার আশ্রিত পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের অনেক সত্য তিনি জেনেছেন। অনেক সময় এসবের শিকার হয়েছেন। তিনি আশাবাদী বর্তমান সময়ে সমাজ পরিবর্তনের যে জোয়ার এসেছে তা ভাসিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের সমস্ত হতাশা ও পশ্চাদপদতাকে। ক্রমেই মানুষ ধাবিত হবে আলোর দিকে। ব্যক্তির জাগরণের মধ্য দিয়ে সংগঠিত হবে মানুষ। এই সংগঠিত শক্তিই বর্তমানকে পৌঁছে দেবে সম্ভাবনাময় ও আকাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যতে।

সাজেদা পারভীন রুনু সকল নির্যাতিতের কণ্ঠস্বর হতে চায়

সোমা দত্ত

শৈশব থেকেই ভীষণ দুরন্ত গাইবান্ধা জেলার পশ্চিমপাড়া গ্রামের মেয়ে সাজেদা পারভীন রুনু। প্রকৃতির নির্মল পরিবেশে শিশুসুলভ উচ্ছাস আর উদ্দামতায় তার বেড়ে ওঠা। কখনো আপন মনে কথা বলা, আবার কখনো বা মনের অজান্তে মাড়িয়ে দেওয়া কচি ঘাসের ডগা। যখন তখন গাছে চড়া আর সাইকেল চালানো ছিল তার নিয়মিত কাজের একটি। বাবার আগ্রহ আর মেজ ভাইয়ের উৎসাহে লেখাপড়ার সিঁড়ি অতিক্রম করেন বেশ সাবলীলতার সাথেই। ১৯৮৪ সালে পড়ালেখা শেষ করে গ্রামীণ ব্যাংকে তিনি প্রথম কর্মজীবনের সূচনা করেন। পড়ালেখা, চাকুরি আর দুরন্তপনার মধ্যে দিয়ে এভাবেই কেটে যায় জীবনের বিশটি বছর। ১৯৪৯ সালে এলাকার যুবক নূরুল আলমকে বিয়ে করে তিনি শুরু করেন যৌথ পথ চলা।

কিন্তু অনেক স্বপ্নের হাতছানি নিয়ে যে যৌথ পথচলা শুরু, তা নিমেশেই হোচট খায় নির্মম বাস্তবতায়। মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম হলেও পরিবারে রুনুর স্নেহ ভালবাসার কমতি ছিলনা কোন দিন। পারিবারিক কাজে মাকে সহায়তা করতে হতো ঠিকই। কিন্তু কখনো দায়িত্ব কাঁধের উপর বোঝা হয়ে চেপে বসে নি। শ্বশুরবাড়িতে ২০-২৫ জনের বড় পরিবার। ভোর থেকেই নানা রকম দায়দায়িত্ব আর ঘরকন্নার কাজ। তা থেকে অবসর মিলে কদাচিৎ। বাড়ির বউ শ্বশুর-শাশুড়িসহ সকলের মন জুগিয়ে চলবে এটাই যেন স্বাভাবিক। কোন রকম ব্যতিক্রম ঘটলেই ঝগড়া বিবাদ। পরিণামে পারিবারিক রায়ে সাজা ভোগ, উপরন্তু সামাজিক সালিশে লাঞ্ছনা। এটাই ছিল তার জীবনে ঘটে যাওয়া নিয়মিত ঘটনা। বাবার বাড়ি যাওয়ার স্বাধীনতা খুব একটা ছিলনা। যদিও কোনদিন যাওয়ার অনুমতি মিলল, বেশিদিন থাকার অনুমতি নেই। একবার বেশি দিন বাবার বাড়িতে থাকার দায়ে তাকে সালিশের মোকাবেলা পর্যন্ত করতে হয়েছে।

বিয়ের পর পরই প্রথম বাধা আসে চাকুরির ক্ষেত্রে। স্বামীর বাড়ির লোকদের বক্তব্য– বাড়ির বউয়ের চাকরি করা চলবে না। শুধু চাকুরিই নয় বাধা আসতে থাকে নানা দিক থেকে। কপালে টিপ পরলে শ্বশুরের মন্তব্য– 'মুসলমানরা টিপ দেয় না, টিপ দেয় ... '। শাড়ীর বদলে সখ করে ম্যাক্সি পরাটাও ছিল জঘন্য অপরাধের সামিল। এভাবে দিনের পর দিন নিগৃহীত হতে থাকে তার সুকোমল সত্তা। দিনে দিনে শ্বশুর বাড়ির পরিবেশ তার কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। একদিন স্বামীর সাথে আলাপ করে ঠিক হলো চাকরিস্থলের কাছাকাছি গাইবান্ধার পলাশবাড়িতে আলাদা বাসায় থাকার ব্যবস্থা হবে। কিন্তু তাদের এ সিদ্ধান্তও গোপন থাকে না। তীব্র বিরোধিতা করে শ্বশুর-শাশুড়িসহ অন্যরা। তার আর নিজের মতো ঘর পাওয়া হলো না। আবারো প্রমাণিত হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার নাজুক অবস্থান।

সবচেয়ে কষ্টের বিষয় এই সিদ্ধান্তহীনতা শুধু পারিবারিক কাজের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, নিজের শরীরের ক্ষেত্রেও ছিল সমান প্রযোজ্য। ১৯৮৬ সালের দিকে তিনি প্রথম মা হওয়ার সম্ভাবনা অনুভব করলেন। দশমাস দশ দিন গর্ভে সন্তান ধারণ করেও নিরাপদ প্রসবের অধিকার মিলল না। বাড়ির বউ কখনো বাহিরের ডাক্তারের কাছে যায় না– এই অজুহাতে। একটানা তিনদিন প্রসব ব্যাথায় ছটফট করার পর অবশেষে বাড়িতে নার্স এলো। সন্তানও হলো, কিন্তু আধা ঘণ্টার বেশি সময় পৃথিবীর আলো দেখার সুযোগ পেলো না। প্রথম সন্তান জন্মের এক বছর পর ১৯৮৭ সালে দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম হলো। তিনি তখন বাবার বাড়িতে। চারদিকে বন্যার থই থই পানি। একদিন রাতে ঘুম থেকে জেগে দেখেন কোলের শিশুটি পানিতে ভাসছে। ডাক্তার ডাকা হলো, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। মাতৃত্বের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় আবার তৃতীয় সন্তান এলো। মানসিক চাপ, প্রতিকূল পারিবারিক পরিবেশে এবারও সন্তান জন্মদানের স্বাভাবিক পরিবেশ নিশ্চিত হলো না। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন রংপুর হাসপাতালে গিয়ে সিজার করে প্রসব করাতে। শ্বশুর-শাশুড়ি কেউ রাজি হলেন না। বিয়ে দিলে মেয়ের উপর বাবার বাড়ির লোকদের অধিকার থাকে না। এ জন্য তারাও জোর করতে পারলেন না। তৃতীয় সন্তান অনেক ঝুঁকির মধ্যে বাড়িতেই জন্ম দিলেন।

অথচ জাতিসংঘসহ সকল আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান মাতৃত্বকালীন সময়কে একজন নারীর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময় বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদে'র ১১ ধারার (চ) অনুচ্ছেদে নারীর নিরাপদ সন্তান জন্মদানের অধিকার নিশ্চিত করার কথা উল্লেখ আছে। একই ধারার (ঘ) অনুচ্ছেদে বলা আছে গর্ভাবস্থায় যে ধরনের কাজ নারীর জন্য ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত, গর্ভকালে তাদরকে সে ধরনের কাজ থেকে বিশেষভাবে রক্ষার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। কিন্তু বাংলাদেশের হাজারো নারীর মতই রুনুর জীবনে এর কোনটিরই প্রতিফলন ছিল না।

বলাবাহুল্য এ ধরনের ঘটনা আমাদের দেশে বিচ্ছিন্ন কোন ব্যাপার নয়। এটি আমাদের চলমান সমাজ প্রক্রিয়ারই একটি জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি। নারীর প্রতি চলমান একটি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সর্বদাই সক্রিয়। যে কারণে আমাদের দেশে দীর্ঘমেয়াদী পুষ্টিহীনতায় ভোগে শতকরা ৫০ ভাগ নারী। গর্ভাবস্থায় প্রয়োজনীয় খাবার পায় না ৮০ ভাগ নারী। একজন গর্ভবতী মায়ের ওজন বাড়ার কথা ১০ কেজি, কিন্তু বাড়ে মাত্র ৫ কেজি। এছাড়াও রক্ত স্বল্পতায় ভোগে শতকরা ৫০ ভাগ নারী। শতকরা ৯০ ভাগ নারী প্রসবের সময় দক্ষ দাইয়ের সহায়তা পায় না। যে কারণে প্রসবকালীন সময়ে প্রতি ঘণ্টায় মারা যায় ৩ জন নারী। এমন অসংখ্য উপাত্ত খুঁজে পাওয়া কোন কঠিন বিষয় নয়। রুনুর মতো এদের কেউ আমাদের মা, আমাদের বোন অথবা অতি আপন জন।

বাংলাদেশের নারীদের এই বঞ্চনা-নির্যাতনের চিত্র সর্ব ক্ষেত্রেই বিরাজমান। তাই রুনু এ ক্ষেত্রে তেমন কোন ব্যতিক্রম নন। কিন্তু এই সাধারণ ঘটনাগুলোর মাঝ থেকে রুনু অসাধারণত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তার জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো তাকে একজন প্রতিবাদী নারীতে রূপান্তরিত করেছে। তিনি নিজের জীবন থেকে প্রমাণ করলেন যে, একবার সাহস করে রুখে দাঁড়ালেই কেটে যায় অন্ধকার।

তার উপর যখন নানা রকম নির্যাতন চলছিল তখন এক পর্যায়ে তার স্বামী কিছুটা সহযোগিতার হাত বাড়ায়। তার সহযোগিতায় রুনু একটি ছিন্নমূল উন্নয়ন সংস্থায় মাত্র এক হাজার টাকা বেতনে কাজ শুরু করেন। কিন্তু কষ্টের পুরোপুরি সমাপ্তি ঘটল না। বরং দায়িত্ব আরো বাড়ল। খুব ভোরে উঠে সংসারের সমস্ত কাজকর্ম সেরে কাজে যেতে হয়। আবার ফিরে এসে পুনরায় কাজের শুরু। পরিবাবের সকলের খাবার যোগান দিয়ে তবেই নিজের ব্যবস্থা। এভাবেই এক পর্যায়ে গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে গ্রামের মেয়েদের সেলাই প্রশিক্ষণদানের কাজ পায়। আরো কিছু বাড়তি রোজগারের সংস্থান হয়। স্বামীর সহযোগিতার হাত আরো খানিকটা প্রশস্ত হয়।

এমন সময়ে তিনি ৬২৫তম ব্যাচে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ পরিচালিত উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণটি তার অনেক পুরাতন ভাবনাকেই বদলে দেয়। নিজের আত্মনির্ভরতা আর স্বাধীনতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না তার চিন্তা। অনেক মানুষকে সাথে নিয়ে তাদের চিন্তাকে বদলে দিয়ে অন্যরকম বাংলাদেশ সৃষ্টি করা সম্ভব– উজ্জীবক প্রশিক্ষণ থেকে পাওয়া এই চেতনা তাকে তাড়িত করে। এ সময় তিনি উপলব্ধি করেন তিনি একা নন। তার মতো হাজারো নারী শুধু নারী হওয়ার কারণে সমাজে নির্যাতিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। সবাইকে সংগঠিত করার তাগিদ অনুভব করেন নিজের মধ্যে।

নিজের অভিজ্ঞতা রুনুকে সাহসী করে তোলে। ভাবতে শুরু করেন অন্যদের নিয়েও। সমাজে নারীদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হলে প্রয়োজন নিজেদের সংগঠিত হওয়া এবং ক্ষমতা কাঠামোতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। বিষয়টি নিয়ে তিনি এলাকার নারীদের সাথে আলোচনা শুরু করেন। নিজের জীবনের সংগ্রামের কথা বলে অন্যদেরকেও উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন। আশাবাদী হয়ে ওঠে অনেকেই। এলাকাবাসীর মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয় রুনুর। ইতোমধ্যে গাইবান্ধা পৌরসভার নির্বাচন ঘোষিত হয়। এলাকার অনেকেই রুনুকে অনুরোধ করেন কমিশনার পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য। নির্বাচিত হলে অনেক মানুষের সাথে কাজ করা, নিজের চিন্তা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া সহজ হবে– এই প্রত্যাশায় অবশেষে নির্বাচনে প্রার্থী হলেন তিনি। ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত গাইবান্ধা পৌরসভা নির্বাচনে ৪,৮৯৩ ভোট পেয়ে কমিশনার নির্বাচিত হন।

নির্বাচিত প্রতিনিধি হওয়ার কারণে তার সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। তার প্রত্যাশা এ সকল নির্যাতিত মানুষের কণ্ঠস্বর হওয়া। নারী পুরুষের বিভেদ দূর করে একটি যৌথ ভবিষ্যৎ নির্মাণ করা। যেখানে নারী শুধুই নারী নয়, একজন পরিপূর্ণ মানবিক স্বত্ত্বা।

নির্যাতন-নিপীড়নের অন্ধকারে হারিয়ে যায় আমাদের দেশের অধিকাংশ নারীর জীবনের সম্ভাবনাগুলো। ব্যক্তি মানুষ হিসেবে তারা যেমন তাদের প্রাপ্য মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হন, পাশাপাশি সমাজ তথা পুরো জাতি বঞ্চিত হয় উন্নয়ন-অগ্রগামিতা থেকে। এটা বাংলাদেশের সাধারণ চিত্র। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের চিত্র দুর্লক্ষ হলেও একেবারে অনুপস্থিত নয়। সমাজে বিরাজমান দীর্ঘ দিনের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর কাজে সংগ্রাম করে যাচ্ছেন অনেক নারী। ব্যক্তিগত গণ্ডি অতিক্রম করে এ সংগ্রাম অনেক ক্ষেত্রেই সামাজিক চরিত্র অর্জন করছে। সাজেদা পারভীন রুনুর মতো নারীরা দেশের নানা প্রান্তে এ সংগ্রাম চালিয়ে একটি সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছেন।